পরিবর্তন

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০







পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

ত্বকের গভীরে গিয়ে, সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে

ম্যাক্স ফ্যাক্টর ক্লীঞ্জিং কোল্ড ক্রীম



ঘন স্নিগ্ধ ক্রীমে ভরপুর, অথচ হাল্কা এই ক্রীম আপনার ত্বক সুন্দরভাবে রক্ষা করে তরতাজা রাখে। এটি ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে দিন শেষের মেক-আপের চিহ্ন, সারাদিনের ধুলো-বালি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করে আপনার ত্বককে কমনীয়, তরতাজা করে রাখার দরুনই ম্যাক্স ফ্যাক্টর কোল্ড ক্রীম আপনার প্রিয়তম সঙ্গী। বিশেষ ফরমূলায় বানানো এই ক্রীম আপনার ত্বককে পরিষ্কার ঝকঝকে করে আপনাকে করে তোলে লাবণ্যময়ী—অপরূপা।



ম্যাক্স ফ্যাক্টর
ক্লীঞ্জিং কোল্ড ক্রীম
আপনার ত্বকের সুরক্ষায়
মনোরম সঙ্গী

M. 51 A/79 Ben

ম্যাক্স ফ্যাক্টর' এর অনিন্দ্যসুন্দর ারের তরফ কে—অব

সম্পাদকীয়

কিছুদিন আগে ফেজানট পাখি নিয়ে নেপালে একটা সম্মেলন হয়ে গেছে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ফেজানট পাখির অবলুপ্তি কিভাবে ঠেকানো যায় তাই নিয়ে আলোচনা করা। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের পক্ষিবিদরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

এই অপরূপ সুন্দর পাখিটি কমতে কমতে এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। আর সেটা হয়েছে মানুষেরই অসাবধানতা আর নিষ্ঠুরতার জন্যে। মানুষ এমন একটি সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদ নির্বিচারে হত্যা করেছে।

এক সময় সুন্দরবনের অধীশ্বর রয়াল বেঙ্গল টাইগারও শেষ হয়ে যাবার মুখে পড়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টাচরিত্র করে তার মৃত্যু ঠেকানো গেছে। এমনই মৃত্যুদণ্ড নেমে এসেছিল ভারতের একশিং গণ্ডারের ভাগ্যেও। কিন্তু ওদের সংখ্যাও এখন বাড়তির মুখে।

কিছুদিন আগে সউদি আরবের রাজপুত্র রাজস্থানের মরুভূমিতে সদলবলে শিকার করতে এসে প্রায় শেষ হয়ে আসা নানা ধরনের পাখির বংশ শেষ করতে বসেছিলেন। নানা মহল থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠায় রাজপুত্রের শিকার-রঙ্গ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখন পৃথিবীর নানা জায়গায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি চেষ্টায় তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে ন্যাশনাল পারক। এইসব ন্যাশনাল পারকে কোনভাবে প্রাণী হত্যা বড় রকমের অপরাধ। চোরাশিকারীরা এসব মানে না, তবু নির্বিচারে প্রাণী হত্যা এখন বন্ধ হয়েছে।

মনে রাখা দরকার পৃথিবীতে প্রায় আড়াই হাজার রকমের পশুপাখি একেবারেই প্রকৃতির বুকে হারিয়ে গেছে। তাদের বংশে বাতি দেবার মতো কেউ নেই। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে মানুষই। এটা কম লজ্জার কথা নয়।

এই প্রসঙ্গেই কয়েকটি কথা তোলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে আগে যে শেয়াল দেখা যেত এবং প্রহরে প্রহরে ডাক শোনা যেত এখন অনেক গ্রাম থেকেই সেই শেয়াল নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমন কথা বলা যায় চিল আর কাক সম্পর্কেও। শহরে এখন চিল প্রায় নেই-ই। গ্রামে কাকও না। মুরশিদাবাদ জেলার একটি গ্রামেই বেশ কয়েকশো শালিখ পাখিকে ঠ্যাং উলটে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। গ্রামবাসীদের মতে ধানের পোকা মারার জন্য ওষুধ ছড়ানোর পরেই নাকি এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটে।

অনেক সময় দেখা যায় গাছের বেলায়ও এই কাণ্ড ঘটছে। কোন কোন গ্রামে দেখা গেছে বাবলা গাছের আর চিহ্নই নেই। এই বাবলা গাছই বাবুই পাখিদের ঝাঁক বেঁধে বসা ও আড্ডা দেওয়ার আদর্শ জায়গা ছিল। বাবলা গাছ নেই,ফলে বাবুইদেরও পাত্তা বিশেষ পাওয়া যায় না বাবুই আর শালিখেরা যে ধানের যে কোন পোকার যম সে কথা কে না জানে।

পশুপাখি নিয়ে এবং কৃষি নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের এবার একসঙ্গে বসে আলোচনা করার সময় এসেছে। কারণ দুটোই এখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। আর তাছাড়া এইসব পশুপাখি রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ মানুষের তো আছেই। এরা সকলেই আমাদের বন্ধু। মানুষ হিসেবে আমাদের যে মর্যাদা তা এদের জন্যেই। এদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে আমরা নিজেরাই কি বাঁচতে পারব?

পরিবর্তন

১ ফেবরুয়ারি ১৯৮০, দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চদশ সংখ্যা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০



সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ ● প্রচ্ছদ আলোকচিত্র : অশোক বসু

চাকরি সংরক্ষণ

'পরিবর্তন' ১ ডিসেম্বর সংখ্যায় মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাকরি সংরক্ষণ করে অনুন্নতদের কতটা উন্নতি হল' এবং শ্রীরজত শুভ্র মুখোপাধ্যায়ের 'তপশিলীদের অনেকে বিশেষ সুযোগের কথা জানেই না' পড়ে খুবই আনন্দিত ও আশান্বিত হলাম।—বৈষম্যমূলক বিভেদসৃষ্টিকারী নীতি আজ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এর সুযোগে তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর কিছু লোক বংশানুক্রমিকভাবে একটা সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হবার সুযোগ পাচ্ছেন—এর বিরুদ্ধে আপনার পত্রিকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রত্যেক ভুক্তভোগী ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসার দাবি রাখে।

মাণিক্যবাবু '৪০ পয়েন্ট রসটারের' ভিত্তিতে তপশীলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত কর্মীগণের প্রতিধাপে বারংবার প্রমোশনের সুযোগের উল্লেখ করেছেন কিন্তু রসটারের সম্যক ব্যাখ্যা প্রবন্ধে রাখেননি। এর বিশদ ব্যাখ্যা জানা না থাকলে কিভাবে রসটারের সুযোগে আগামী দিনে সমস্ত উচ্চতর পদই জুনিয়র সংরক্ষিত কর্মীগণ ছিনিয়ে নেবেন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ভোগ করার সুযোগ পাবেন তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। তাই আমি এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি।

'৪০ পয়েন্ট রসটার' কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তৈরি সরকারি চাকুরিতে প্রযোজ্য জাতিভিত্তিক একটা প্রমোশন নীতি যা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমোশন সর্বভারতীয় নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করছে। এই রসটার পোসটের সংখ্যানুসারে বিবেচিত না হয়ে ভ্যাকেনসি অনুসারে বিবেচ্য।

কোন নির্দিষ্ট পোসটে একজন কর্মী চিরদিন কাজ করেন না। সেই পোসটে বারংবার ভ্যাকেনসি হয়। এই এক একটা ভ্যাকেনসি এক একটা পয়েন্ট। এইরূপ ৪০টি পয়েন্টকে নিয়ে যে ফরমুলা তাকেই বলা হয় ৪০ পয়েন্ট রসটার।

এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে ৬টি যথা ১, ৮, ১৪, ২১, ২৮ এবং ৩৬ তপশীলী জাতিভুক্ত কর্মীগণের জন্য চিহ্নিত যা গাণিতিক হিসাবে শতকরা ১৫ এবং ৩টি যথা ৪, ১৭ এবং ৩১ তপশীলী উপজাতিভুক্ত কর্মীগণের জন্য চিহ্নিত যা গাণিতিক হিসেবে শতকরা সাড়ে সাত। আপাতদৃষ্টিতে হিসেব ত্রুটিহীন মনে হয় কারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে যে শতকরা ভাগ এদের জন্য নির্দিষ্ট তার চেয়ে এখানে বেশি দেখানো হয়নি। বাকি পয়েন্টগুলো যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার্য যার অংশ সংরক্ষিত সিনিয়র কর্মীও পেতে পারেন। এক কথায় বাসে, ট্রামে লেডিস সিটের ব্যবস্থার ন্যায়—লেডিসের জন্য লেডিস সিট রিজার্ভড উপরন্তু তারা জেনারেল সিট দখল করলে বলার কিছু নেই।

রসটারের ফরমুলার চাতুর্যে কিভাবে আগামী দিনে ১০০% উচ্চতর পদই সংরক্ষিত কর্মীগণ ছিনিয়ে নেবার সুযোগ পাবেন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক কোন ডিপার্টমেন্টে চারটি আফিস সুপারিনটেনডেন্টের পোসট আছে। এই সিনিয়র পোসটগুলোতে সাধারণত অসংরক্ষিত কর্মীগণ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীবনের শেষ ক্ষেত্রে উন্নীত হন এবং এবং ২/৩ বৎসরের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করেন। ভ্যাকেনসি হতেই রসটার অনুযায়ী ১ নং পয়েন্ট তপশীলীজাতিভুক্ত কর্মী-পাবেন এবং ক্রমান্বয়ে ২ ও ৩ নং পাবেন অসংরক্ষিত সিনিয়র কর্মীগণ আর ৪ নং পাবেন তপশীলী উপজাতিভুক্ত কর্মী।

গাণিতিক হিসেবে ৪টির মধ্যে ২টি পেলেন জুনিয়র সংরক্ষিত কর্মীগণ যা শতকরা হিসাবে ৫০%। ১ নং ও ৪ নং পয়েন্ট সংরক্ষিত কর্মীগণ দখল করার ফলে কমপক্ষে ১৫-২০ বৎসরের জন্য ঐ পোসট দুটিতে ভ্যাকেনসির কোন সম্ভাবনা রইল না। কিন্তু ২ নং ও ৩ নং পয়েন্টের অসংরক্ষিত কর্মীগণ ২/৩ বৎসর পরপর ক্রমান্বয়ে অবসর গ্রহণ করবেন এবং ৫-৬-৭-৮ নং পয়েন্ট কার্যকরী হবে। এরমধ্যে ৮ নং পয়েন্ট পাবেন তপশীলী জাতিভুক্ত কর্মী। ফলে সেই ৪টি পোসটের মধ্যে ৩টিই পেয়ে গেলেন সংরক্ষিত কর্মীগণ যা গাণিতিক হিসেবে ৪-এর মধ্যে ৩ অর্থাৎ ৭৫%। অনুরূপভাবে রসটারের পয়েন্টগুলো চক্রের ন্যায় আবর্তিত হয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ৪টি পোসটই জুনিয়র অনভিজ্ঞ সংরক্ষিত কর্মীগণ গ্রাস করবেন আর অসংরক্ষিত যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মীগণের ভাগ্যে জুটবে শূন্য।

এই অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক, জাতি বৈষম্যমূলক বিভেদসৃষ্টিকারী প্রমোশননীতি অবিলম্বে বাতিল না হলে।

১) অদূর ভবিষ্যতে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্যের পরিচালনায় প্রশাসনিক দক্ষতার চরম ক্রমাবনতি ও শেষ পর্যন্ত প্রশাসন ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে এবং রেলওয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনায় জনসাধারণের নিরাপত্তা আরও বিঘ্নিত হয়ে জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

২) ভাগ্যবিড়ম্বিত সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মীদের মনের হতাশা সামগ্রিক কর্মবিমুখতায় রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় উৎপাদন আরও হ্রাস পাবে।

৩) জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার অর্থ —দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি এবং জনসাধারণের উপর আরও নতুন করভার।

৪) উৎপাদন ব্যাহত হলেই কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সঙ্কুচিত হয়ে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যাকে জটিলতর করে তুলবে।

৫) নতুন এক জাতি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে।

সুধীর দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক,
অল ইনডিয়া নন রিজার্ভড এমপ্লয়িজ
অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা

আসন সংরক্ষণ

১৬ নভেম্বরের পরিবর্তনে সুদীপ মজুমদারের 'উপজাতিগুলির আসন সংরক্ষণ আর কতকাল? কার স্বার্থে?' শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। লেখকের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেছে নেওয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ এবং সম্পাদক মহাশয়ের যথেষ্ট সময় সচেতনতার পরিচয় লক্ষণীয়।

বিগত ত্রিশ বছরের সংরক্ষণের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো তথাকথিত তফশীলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দৌলতে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় জাতি বিশেষভাবে লাভবান হয়েছে এবং অপরদিকে অধিকাংশ জাতি বা উপজাতি সুপরিকল্পিত দারিদ্র্য এবং নিপীড়নের শিকার হয়েছে। মূল যে উদ্দেশ্যের জন্য সংরক্ষণ মেনে নেওয়া হয়েছিল তা মোটেই ফলবতী হয়নি। 'আসলে উন্নতিটা শুধু একগুচ্ছ নেতার'—তা সর্বাংশে সত্য।

সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি তফশিলী জাতি বা উপজাতি জনসমাজের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হয় তবে দেখা যাবে যে অধিকাংশ বিত্তশালী বা চালবাজ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না—শুধুমাত্র 'প্রেসটিজের' জন্য অথচ তারাই সংরক্ষণের সকল সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ আত্মসাৎ করছে। তাই বিত্তবান ও ছদ্ম তপশীলী জাতি বা উপজাতিদের ভোটের অভাবে এই ধরনের একটা সাধু প্রচেষ্টা (সংরক্ষণ) উঠে যাবে এবং তথাকথিত গরীব, নিপীড়িত মানুষের হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

কোনওরূপ নির্বাচন না করে সারা দেশের সংরক্ষণ জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্থিক সংগতির নিরিখেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্তত এ ব্যাপারে সুদীপবাবুর সঙ্গে বর্তমান পত্র লেখক একমত। আর্থিক সংগতির বিচারে সংরক্ষণ কার্যকর হলে বিপুল জনসমাজের প্রভূত উন্নতি বিধান হবে। দরিদ্র জনসমাজকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের যথাযথ মর্যাদা লাভের পথ সুগম করতে সংরক্ষণের এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

সুখময় মণ্ডল, বসিরহাট

সাঁইবাবা

'সাঁইবাবা-একটি অজানা রহস্য' পড়লাম। সাঁই বিরোধী গুরুদেবের শিষ্য হয়ে সাঁই নিন্দা মন্দ লাগেনি। কিন্তু ভাল লাগেনি টল ব্রুকের ভারতীয় নিগূঢ় সাধন পদ্ধতির নিন্দা-বাদ। জিন্দাবাদ তাই দিইনি 'লর্ড অব দ্য এয়ারকে'।

ব্রুক তার বইয়ে যেসব রতি-ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন তা আমাদের দেশের শাক্ত বৈষ্ণব, সুফী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পবিত্র গুহ্য সাধন প্রণালীর অংগ বিশেষ। অভাগবতীতনু একজন বিদেশীর পক্ষে সে কথা তো বোধগম্য নয়। শাক্তের বামাচার এবং বৈষ্ণবের শৃংগার সাধনাতো টল ব্রুকের কাছে স্বপ্নের ব্যাপার। পঞ্চ 'ম' কার সাধনার প্রধান অংগ 'মৈথুন' আর বৈষ্ণবের গূঢ়তম সাধনার ন্যম 'শৃংগার' কাব্যরস নয়; প্রকৃত পক্ষেই প্রাকৃত নরনারীর রমণসাপেক্ষ সাধন প্রণালী। এই শৃংগার সাধন সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা করে প্রসঙ্গের শুরু করব।—এই সাধনায় সাধক-পুরুষ ও সাধিকা-নারী পরস্পরে শৃংগার রসাত্মক সাধনাবলম্বনে শুক্রের অধোস্রোত রুদ্ধ করে থাকেন।

যারা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তাদের পক্ষে যথেচ্ছ রতি ক্রীড়া ক্ষতির কারণ নয়। এ প্রসঙ্গে রায় রামানন্দের কথা মনে পড়ে। তিনি নায়িকাদের সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতেন,—যেমন,—

এক দেবদাসী আর সুন্দর তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অংগ হয় তার দর্শন স্পর্শন।
(চৈতন্য চরিতামৃত)

সুতরাং টল ব্রুকের 'টেল' অন্তস্তের বমন ছাড়া কিছুই নয়। সিদ্ধ পুরুষের এসব সাধনায় অধিকার আছে। সাঁইবাবারও যে অধিকার নেই তা কে বলতে পারে? হয়ত তিনি সিদ্ধ।

সাধারণের পক্ষে বোঝা কষ্ট এবং সাধারণ্যে প্রকাশ নিষিদ্ধ হলেও রতি-ক্রীড়া-জনিত সাধনার পক্ষে সমর্থনের জন্য শৃংগার সাধনার কিছু আচরণ পদ্ধতি বিবৃত করা হল —এই সাধনায় প্রথমে 'রেচন' ক্রমে 'পূরণ' এবং 'কুম্ভক' করে সাধক-নারীপুরুষের যৌন মিলনে আবদ্ধ হতে হয়। পরে শৃংগারাসক্ত অবস্থায় প্রথমে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দিয়ে বা নাসারন্ধ্র বন্ধ করে ষোলবার মূলমন্ত্র জপ করতে করতে ডান নাসারন্ধ্রে শ্বাস 'রেচন' করে, আবার ডান নাসারন্ধ্র বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বন্ধ রেখে বত্রিশবার মূলমন্ত্র জপ করতে করতে বাম নাসারন্ধ্রে শ্বাস বায়ু পূরণ করতে হয়, এরপর উভয় নাসারন্ধ্র বন্ধ করে চৌষট্টিবার মূলমন্ত্র জপ করতে করতে 'বায়ুস্তম্ভন' করলে সুষুম্নাগ্রন্থি উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শৃংগারে নির্গত শুক্র ঊর্ধ্বগামী হয়। একে ঊর্ধ্বরতি অবস্থা বলা হয়।

সাঁইবাবা হয়ত সেই নিগূঢ়তম সাধন পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে টল ব্রুকের মত অযোগ্য শিষ্যের নিকট হাস্যাস্পদ বিবেচিত হয়েছেন। অপাত্রে তাই এসব গোপনতম তত্ত্বসমূহের প্রকাশ গুরুদেবগণ প্রায়ই করেন না। বাবাজীর পাত্র চিনতে কিছু ভুল হওয়া বিচিত্র কি? সাঁইবাবার পাত্র নির্বাচন অভ্রান্ত না হলেও ভারতীয় সাধকদের সাধন প্রণালী যে অভ্রান্ত তা নিঃসন্দেহ। তাই, ভারতীয় নিগূঢ় সাধন প্রণালীর এই রূঢ় সমালোচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাখলাম।

ভবদেব বিশ্বাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বালকবাবা

১৬ ডিসেম্বরের পরিবর্তনে বিশ্বজিৎ সিংহ "বালকবাবা কি সত্যিই ভগবান?" এক একটি সুন্দর নিবন্ধ রচনা করেছেন। খুবই অন্তরঙ্গ হয়েছে নামকরণেই জিজ্ঞাসা চিহ্নটি ব্যবহৃত হওয়ায়। এটি লেখকের দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়। সাম্প্রতিক অ্যাটম যুগের মানুষও যে কত বোকা, তার একটি নিখুঁত নিদর্শন রয়ে গেল বীরভূমের এই আস্তা গ্রামে। প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার মানুষের রোগমুক্তি (?) হলো। আচ্ছা, প্রতিদিন যদি ১০/১৫ হাজার রোগগ্রস্ত মানুষের রোগ ভালো হয়, তাহলে তো মাত্র ক'দিনেই বালকবাবা (স্বয়ং ভগবান?) পশ্চিমবঙ্গের এমন কি সারা ভারতেরও রোগগ্রস্ত মানুষকে রোগমুক্ত করতে পারেন। তাহলে তো পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতেই এমন কি বিশ্বেও আর রোগ থাকে না। বিশ্বজিৎ-বাবু আরও একটু স্পষ্ট করে ভাঁওতাবাজীর নজির উপস্থাপিত করতে পারতেন, কেন সংকোচ করেছেন বোঝা যায় না। হয়তো সাংবাদিক কর্তব্য দেখাবেন তিনি। তবুও—বহু রোগাক্ত মানুষ যে আস্তায় আজও প্রতারিত হচ্ছেন, সেই প্রতারণা থেকে মানুষকে মুক্ত করাও তো তার দায়িত্ব। স্বীকার করি—নানাভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন ব্যাপারটা। কিন্তু বিশ্বজিৎবাবু, যে মানুষ ভাবে যে আস্তায় গেলেই আমি অন্ধচোখ ফিরে পাবো, সে মানুষ কি এত সহজেই বিশ্বাস করবে যে আস্তা একটা ভাঁওতার জায়গা? আস্তায়

রোগমুক্ত হয় না। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এর পিছনেও কিছু অর্থলোভী স্বার্থবাজ মানুষের কালো হাত কাজ করছে। আগে দক্ষিণা লাগতো না, এখন লাগে। আগে স্নানের জন্য পয়সা গুনতে হতো না, এখন হয়। এ প্রসঙ্গে বালকবাবার বাবা পাগল মাল একদিন আমাকে বলেছিলেন: অরাই টাকা ল্যায়, অরাই ফয়্যাদি বিদ্যায় করে, আমাকে টাকা-কড়ি কিছুই দ্যায় না।

স্থানীয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'দিদিভাই' (১৯/১১/৭৯)-এ প্রকাশ—"আন্ডা গ্রামের বালকবাবা এখন নিজেই বিব্রত এবং বঞ্চিত। তাকে কেন্দ্র করে অন্যে মুনাফা লুটছে, ব্যবসাও জমিয়ে বসেছে…। সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত এই 'গড বিজনেস' বোধহয় অবাধেই চলবে।" সত্যিই ভগবানের ব্যবসা চলছে আন্ডায়। ধরমপুর, বরলা, কুরুমগ্রাম, বুজুং, শেরপুর, চাঁদপাড়া, তৈলপাড়া, দোখলমাটি প্রভৃতি গ্রামের কমপক্ষে ১০০ জন মানুষকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, তারা কেউ-ই উপকার পাননি। এলাকার মানুষ তাই আন্ডাকে বহু আগেই প্রতারণাক্ষেত্র রূপে চিহ্নিত করেছেন। এখন তাই দূরের মানুষের ভিড়। স্বীকার করি, মানুষ যতই জানছেন, আনাগোনা ততই কমছে। আগের থেকে ভিড়ও এখন অনেক কম। তবুও তো আসছেন। তাই আপনাদের বহুল প্রচারিত স্পষ্ট উচ্চারণের পত্রিকার মাধ্যমে তথাকথিত অজস্র দুর্বলচিত্ত জনমানুষের জ্ঞাতার্থে বিশ্বজিৎবাবুর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে জানাচ্ছি যে, প্রতারিত হবার ইচ্ছা না থাকলে—রোগ মুক্তির আশায় আন্ডায় কেউ আসবেন না। আন্ডায় একটি সাধারণ শিশুকে (বালকবাবা) কেন্দ্র করে একটি প্রতারণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমার বাড়িতেই দু'জন আন্ডা ফেরৎ রুগী রয়েছেন, যারা কণামাত্র উপকৃত নন। শিশু অনাথকে শিশুর মতো খেলতে দিন, তাকে ভগবান ব্যবসায় নামিয়ে অর্থলোভীর কালো হাত মোটা করবেন না।

আদিত্য মুখোপাধ্যায়, বরলা, বীরভূম

মামলার পাহাড়

১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'আদালতে মামলার পাহাড় কেন তৈরি হচ্ছে', সে প্রসঙ্গে লেখক যে যুক্তির অবতারণা করেছেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তিনি সরকারি উকিল ও এ. পি. পি-দের প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। আমার মনে হয় লেখক দুই-একজন উকিল বা এ. পি. পি-দের কার্যকলাপের দ্বারা গোটা সরকারি উকিল ও এ. পি. পি-দের সাধারণীকরণ করেছেন, সেটা কিন্তু ঠিক হয়নি।

সরকারি উকিলদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের দ্বারা নিষ্পত্তি হোক এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে উকিলদের লাইসেনস বাতিল করার বিধান চালু হোক।

এ. পি. পি-দের ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি সরাসরি তাদের বরখাস্ত করুন; Open secret কথাটি ইদানীং ব্যাপক ও বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এটাকে রোধ করা যায় কিনা তা চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নিছক তদন্তে ফল পাওয়া যাবে না। আরও অমোঘ অস্ত্রের প্রয়োজন হবে। সেটা না হলে প্রশাসনে বা অন্য কোন বিভাগে দুর্নীতি বা বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ হবে না। ক্রমশ বেড়ে চলবে।

বিশ্বনাথ রায়, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

বিদেশী পুরস্কার

১৬ নভেম্বর সংখ্যায় নির্মল ধর 'বিদেশী পুরস্কার: বাংলা ছবি' শীর্ষক আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। প্রথম প্রশ্ন, শ্রীধর কি পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে প্রবন্ধটি লিখেছেন? মনে হয় না।

তিনি লিখেছেন, "বাংলা ছবির ইতিহাসে 'পথের পাঁচালি' যেমন একটি মাইলস্টোন, তেমনি ঋত্বিক ঘটকের প্রায় প্রতিটি ছবিই চিরায়ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি করতে পারে।"

ঋত্বিক ঘটকের প্রতি আমি পূর্ণশ্রদ্ধাশীল হয়েও বলবো, সত্যজিৎবাবুর একটি মাত্র ছবি তার প্রতিটি ছবির সমগোত্রীয়—এমন ধরনের চিন্তা করলে ঠিক ন্যায্য বিচার হয় না। সত্যজিৎবাবুর অপু-চিত্রত্রয়ী সমগ্র বিশ্বে সর্বকালের অমূল্য সম্পদগুলোর মধ্যে পড়ে। ঋত্বিকবাবুর 'অযান্ত্রিক'ও তাই। কিন্তু সত্যজিৎবাবুর আরও কিছু ছবি আছে যেগুলোও এক-একটি 'মাইলস্টোন'। অবশ্য তার প্রদর্শিত পথে পরবর্তী পরিচালকেরা এগোলেন না। ধরুন, 'চারুলতা', 'অশনি-সংকেত', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'জন অরণ্য', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'—এগুলো এক-একদিকে মাইলস্টোন। 'চারুলতা'র চলচ্চিত্রগুণ সব ক'টিকেই ছাড়িয়ে গেছে। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর চলচ্চিত্র আমার দৃষ্টিতে আর একটিও ভারতে হয়নি।

ঋত্বিকবাবু দুর্দান্ত পরিচালক। কিন্তু তার অতিরিক্ত চিন্তাশীলতা তার চলচ্চিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে, প্রয়োগগত প্রাঞ্জল লাবণ্যকে হরণ করেছে মাঝে মাঝে।

মৃণালবাবুও একজন বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালক, সন্দেহ নেই। কিন্তু তপনবাবুর সঙ্গে তুলনায় তার ছবির 'লিরিক্যাল চার্ম'-এর বড় অভাব। মাঝে মাঝে ছবির বক্তব্য সোচ্চার হয়ে ওঠে—যেমন, 'ইনটারভিউ', 'পদাতিক'।

তপনবাবুর প্রতিভা নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠিত কাহিনীকেই পর্দায় উজ্জ্বল রূপ দান করতে পারেন, মৌলিক প্রতিভার দিক দিয়ে সত্যজিতের তুলনায় দীন। একমাত্র ঋত্বিকই সত্যজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী—আমার দৃষ্টিতে। সবদিক বিচারে।

শ্রী নির্মল ধর প্রশ্ন তুলেছেন—"'চারুলতা' ছবির মাধবী মুখারজি বিচারকদের নজর এড়ালেন কি করে?…'চারুলতা' কিংবা 'অশনি সংকেত' ছবির জন্য সৌমিত্র চ্যাটারজির পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল নয় কি?"

উত্তরে বলছি—'চারুলতা' ছায়াছবি বার্লিনে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছে এবং 'অশনি সংকেত' পেয়েছে শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা। একটি ছবিকে একাধিক পুরস্কার দেওয়ার প্রথা ওখানে নেই। শ্রীযুক্তা মাধবী মুখারজিকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দেওয়ার জন্য ('মহানগর' ছবিতে) বার্লিনের কয়েকজন বিচারক সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি 'মহানগর' শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পাওয়ায় মাধবী দেবী পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন। বার্লিনে তখন খুব সূক্ষ্ম বিচার হতো এবং তর্কাতর্কির চূড়ান্ত হতো বিচারকদের মধ্যে। বর্তমানে অবশ্য 'রাজনীতি' ঢুকেছে পুরস্কার দানে।

নির্মলবাবু বলেছেন—"বার্লিন উৎসবে ১৯৬৬ সালে ছবিটি (নায়ক) গিয়েছিল। কিন্তু পুরস্কার পায়নি।"

তার একটি খবর জানা নেই—'নায়ক'কে কেন্দ্র করে সত্যজিৎবাবুর সব ছবিকে ভিত্তি করেই একটি 'বিশেষ পুরস্কার' দেওয়া হয়েছিল সেবার। তাছাড়া, সাংবাদিক সমালোচকদেরও একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। 'জন অরণ্য' লনডন চলচ্চিত্র উৎসবে (অ-প্রতিযোগিতা-মূলক) প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। যেমন পেয়েছে 'শতরঞ্জ-কি-খিলাড়ী'। এসব খবর অতি বিশ্বস্তসূত্রে আমি পেয়েছি। প্রমাণপত্রও আছে। 'প্রতিদ্বন্দ্বী-সীমাবদ্ধ-অরণ্যের দিন রাত্রি' আমেরিকার সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল।

অভিনয়ে সাধারণত আমরা বিদেশী অভিনেতাদের পাশে (আনডার-অ্যাকটিং বা ওভার-অ্যাকটিং) দাঁড়াতে পারি না—এই অপ্রিয় সত্যটা নির্মলবাবুর স্বীকার করতে বাধা ছিল কি? শ্রীযুক্ত উত্তমবাবুর 'article'-এ কোনো একটি কাগজে কিন্তু আমি পড়েছিলাম, মনে হচ্ছে, তিনি সবিনয়ে এই রূঢ় সত্যটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের পর।

ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ধর লিখেছেন—"তার মত ক্ষমতাবান পরিচালক এদেশে আর জন্মেছে কি?" ধর বাবুর এটি ব্যক্তিগত মত হতে পারে। আমি কিন্তু কথাটি পুরোপুরি স্বীকার করি না। হ্যাঁ, এটা ঠিক—'সমসাময়িক সবার থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন।' কিন্তু যে ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি চিন্তার প্রাচুর্যের অরণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, সেই ক্ষমতাকে আমি অবিসংবাদিত ক্ষমতা বলবো না। বরং চিন্তাশক্তিকে 'এভারেসট'-শীর্ষ থেকে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'-য় নামিয়ে এনে প্রয়োগগত প্রসাদগুণ ও লাবণ্যের অরুণকাঞ্চনকান্তিতে উদ্ভাসিত করলে সেই আর্ট বা শিল্প অনেক বেশি কার্যকর হয়। সত্যজিৎবাবুর যা আছে। তিনি তো নিজেই বলেছেন—"ঋত্বিক আমার চেয়ে বেশি বাঙালী।" আমারও মনে হয় তাই। নইলে বাঙালীর একটি প্রধান সমস্যা (অর্থাৎ যুদ্ধোত্তরযুগের তথা স্বাধীনোত্তর যুগের উদ্বাস্তু সমস্যা) নিয়ে আর কোনো পরিচালক তে মননশীল ছবি করতে সাহসী হননি! 'মেঘে ঢাকা তারা' বা 'সুবর্ণরেখা'য় বাঙালী উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে, তাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনকে কেন্দ্র করে প্রকৃত শিল্প সৃষ্টির এমন সুন্দর প্রয়াস আর কোনো ছবিতে দেখেছি কি?

নির্মলবাবু স্থিতধী। তার একাধিক নিবন্ধ আমার এযাবৎ পঠিত। কিন্তু তিনি যদি আরও একটু পক্ষপাতিত্ব-মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো আলোচনা উপহার দিতে পারেন, আমাদের মতো 'নাতি-বুদ্ধি নাতিমূর্খ' সিনেমারসিক মানুষদের উপকার বেশি হয়।

অরুণকান্তি লাহিড়ী,
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৬০

নেতাজী কন্যা

শ্রী তিমির মজুমদারের পত্রটি পড়লাম। তিমিরবাবু লিখেছেন তথাকথিত নেতাজীর কন্যার সংবাদ ছবিসহ বেশ ফলাও করে পরিবর্তনে ছাপা হয়েছে এবং এটা নেতাজীর বিরুদ্ধে কাদা ছিটানোর খেলা যা বহু পূর্বেই শুরু হয়েছে। তিনি তথ্য সহযোগে প্রমাণ করতে চেয়েছেন নেতাজী কন্যা এবং বিবাহ কাহিনী অসত্য এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই ব্যাপারটা আজও বিতর্কিত এবং আলোচনা আরো চলুক আমরা এই চাই—শুধু এই পত্রে আমার জানা একটি পত্রের উল্লেখ করছি যদি তিমিরবাবু এবং আরো অনেকের সন্দেহ নিরসনে সাহায্য করে কিছু আলোকপাত করে তাই। পত্রলেখক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী যিনি নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে পরিচিত।

৪৭ নিউ বালিগঞ্জ রোড,
কলকাতা—৩৯
১৪.২.৭৬

প্রীতিভাজনেষু

আপনার চিঠি পেলাম। অনিতাকে এবং বিশাল ভারতবর্ষের অগণিত অধিবাসীর বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সংবাদ রাখা আমার সাধ্যাতীত। নেতাজীর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানবার আগ্রহ স্বভাবতই আমার কম। নেতাজী কেবল ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন—ইতিহাস স্রষ্টা। এবং ইতিহাসের সেই শক্তিধর নায়কের সঙ্গ লাভ করেছি এবং অন্যের লেখা বই পড়ে অনেক প্রসঙ্গ জেনেছি। তাই আমি বলতে চেষ্টা করেছি।

অনিতা যখন কলকাতায় এসেছিল, সে তখন ছিল শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে। আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানেই আমার সঙ্গে অনিতার পরিচয়। বসু পরিবারের অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই পরিচয় প্রসঙ্গে আমাকে জানানো হয় অনিতা নেতাজীর কন্যা। বসু পরিবারের সবাই, তার মধ্যে নেতাজীর অন্যতম জ্যেষ্ঠ সহোদর সুরেশ বসু ও ছিলেন, —যাকে নেতাজীর কন্যা বলে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন—সে কথা বিশ্বাস করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিলনা। থাকা উচিৎ নয়। শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর গৃহেও এরপর অনিতাকে দেখেছিলেম। অনিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাসন্তী দেবীকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। এছাড়া জার্মানীতে নেতাজী প্রতিষ্ঠিত আই এন এ র সভ্যরা ও বার্মার রণক্ষেত্রের অবশিষ্ট সাথীরা অনিতাকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানান, তার বিবরণ দেখতে পাবেন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীঃ আয়ার লিখিত Unto Him a Witness নামক পুস্তকে।

প্রসঙ্গত বলি অনিতার জন্ম হয় জার্মানীতে। তৎকালে যে সব ভারতবাসী অনিতার পরিচয় অবিশ্বাস করে বা করেছে তাদের কেউই উপস্থিত ছিল না। অলমিতি,
নিঃ শ্রী নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

পত্রটি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

অমল চক্রবর্তী,
কোচবিহার

ভ্রম সংশোধন

মুদ্রণ প্রমাদবশত পরিবর্তন ১ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাশিচক্রে বৃহস্পতি ও কেতুর অবস্থান সূচিত হয়নি। বৃহস্পতি বৃষে অর্থাৎ লগ্ন থেকে একাদশ স্থানে এবং কেতু দ্বাদশ স্থানে অবস্থিত।

এ ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক



হায় আল্লা
আয়াতুল্লা
এ কি ভীষণ খেলা
মুণ্ডু নিয়ে
গেণ্ডুয়া তোর
এ বেলা ও বেলা।
মোল্লাশাহীর
কোরাণ হাতে
জঙ্গী ফরমান-ই
জবাই হল



অম্লমধুর

হাজার প্রাণী
Mass Scale-এ
কোরবাণী ॥

*

'যত অনিষ্টি কম্যুনিস্ট-ই'
বলেছিল মানু দাদা
মোরা মেনেছিনু সে সব বাণী
মনগুলি বড় সাদা।

'সব ঝামেলার মূলে আছে তার
যত কংগ্রেস ধাড়ি'—
জ্যোতির বারতা শুনে মোরা ফের
সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ি।

রাজায় রাজায় বাক্‌বিতণ্ডা
উলুখড় জনগণ,
পেঁয়াজের কিলো সাড়ে পাঁচ টাকা
কেরোসিন ঠন্‌ঠন্‌ ॥

ভাস্কর দাশগুপ্ত

যতই বলুন ঃ ঠাট্টা,
যার কেউ নেই ভরসা দেবার
তারও আছে সাট্টা।

*

মিনি বাসের ম্যাক্‌সি ভাড়া
ট্যাক্‌সি ভাড়াও বেশি,
পারেন যদি ঘাড় গুঁজে যান
ফুলবে কাঁধের পেশী।

*

এই করেছো ভালো নিঠুর
এই করেছো ভালো;
ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিলে
অমাবস্যার আলো।

*

মরেও মরেনা যাহা
বেঁচেও না বাঁচে—
সে-ই জানে মানে, যার
টেলিফোন আছে। **অনার্য মিত্র**



ব্যঙ্গচিত্র ঃ লাহিড়ী

দেশে দেশে

বর্ণবিদ্বেষীর হাতে পারমাণবিক বোমা

বল্মীক

মারকিন এক উপগ্রহ মারফৎ অদ্ভুত দুটি আলোর ঝলক ধরা পড়ল গত বছরের ২২ সেপটেম্বর। প্রায় এক মাস ধরে সেই আলোর ঝলক বিশ্লেষণ করার পর মারকিন প্রশাসন ঘোষণা করল, দক্ষিণ আফরিকা দক্ষিণ সাগরের প্রত্যন্ত কোনো জায়গায় আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

দক্ষিণ আফরিকা সরকার প্রথমে এই ঘোষণা অস্বীকার করে কিন্তু পরে তা স্বীকার করে। সারা আফরিকার মানুষই এখন জানেন, দক্ষিণের এই বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার পারমাণবিক কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছে।

ধরা যাক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আণবিক কৌশল মিত্রশক্তির হাতে না গিয়ে হিটলারের হাতে পড়েছে, তবে কী হতো? দক্ষিণ আফরিকার ক্ষেত্রেও সেই একই ভয় থেকে যাচ্ছে।

কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার এবং কথায় কথায় প্রাণদণ্ড দেওয়া দক্ষিণ আফরিকায় একটি সাধারণ ঘটনা। তার ওপর আছে প্রতিনিয়ত তাড়া খাওয়া। এ দেশের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী এ. এইচ ডু'প্লেসিস নিজেই স্বীকার করেছেন— ৮৫ হাজার মানুষের কোনো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এই ৮৫ হাজারের মধ্যে ভারতীয়রাও আছে।

জোহানেসবারগের পত্রিকা 'স্টার' একটা খবর দিয়েছে ঃ গত মারচ মাসে রোবেন দ্বীপ থেকে দশ বছরের কারাবাস শেষ করে ফিরে এসেছেন গিরিজা সিং। আগামী পাঁচ বছর তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পরিবারের একেবারে নিকটজন ছাড়া কারোর সঙ্গেই তিনি দেখা করতে পারবেন না। তাকে ডারবানের সেভিলেতে থাকতে হবে।

গিরিজা সিং নাটাল সাবোতাজ কেসে ধরা পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন নাটাল ইনডিয়ান কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা। দক্ষিণ আফরিকার ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এখন একটি নিষিদ্ধ দল। অবশ্য কার ওপরই বা নিষেধাজ্ঞা নেই!

শ্বেতাঙ্গরা যেখানে বসবাস করে সেখানে ভারতীয় বা কৃষ্ণাঙ্গদের যাওয়া বারণ, যে পারকে শ্বেতাঙ্গরা যায় সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ নিষেধ. রেল স্টেশনে যাবার জন্য শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের সিঁড়ি আলাদা

রাষ্ট্রসংঘ ব্যাপারটি কোনদিনই ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৬০ এবং ১৯৭২ খৃস্টাব্দে এই বর্ণবৈষম্য নীতির জন্য রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ আফরিকাকে হুঁশিয়ারি পাঠায়। কিন্তু তাতে কোনো ইতরবিশেষ হয়নি।

ইতোমধ্যে নামিবিয়ার ওপর থেকে দখলদারি ছেড়ে তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেবার আর একবার নির্দেশ পাঠানো হয় কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি দক্ষিণ আফরিকা। যথারীতি এখানকার মানুষদের উপর সে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে এ কারণে আবার তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

দক্ষিণ আফরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের রচিত সাহিত্যকে বলা হয় নিকষ কালো মহাদেশ থেকে ভেসে আসা ফিসফিসানি। কারণ প্রথম যখন শ্বেতাঙ্গরা এদেশে ঢোকে তখন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের সঙ্গীত ছিল উচ্চকণ্ঠ, দামামার ধ্বনি ছিল জঙ্গলব্যেপে, লোক-সাহিত্য ছিল সাড়া জাগানো, ঘুমপাড়ানী গান নয়।

শ্বেতাঙ্গরা ক্রীতদাস জোগাড় করার একটা সমৃদ্ধ বাজার পেয়ে গেল। এখান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জোগাড় করে জাহাজের খোলে পুরে চালান দেওয়া হতো। জানা গেছে, তখন প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ করে নিগ্রো অনাহারে, দাস ব্যবসায়ীদের গুলিতে এবং দমবন্ধ হয়ে মারা যেত। এই ভয়াবহ মৃত্যুর মধ্যেও তারা চুপিসারে তাদের সঙ্গীত ও লোককথা পাশ্চাত্যে বহন করে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ আফরিকায় এই কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়নের আন্তর্জাতিক নাম অ্যাপারথিড। রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৮ খৃস্টাব্দকে অ্যাপারথিড-বিরোধী বর্ষ হিসেবে উদযাপিত করে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

দক্ষিণ আফরিকায় অধিকাংশ ব্যবসার মালিক শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়, অধিকাংশ জমির মালিক তারাই। তাদের খনিতে, কারখানায়, জমিতে কায়িক পরিশ্রম করে কৃষ্ণাঙ্গরা। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের দেশত্যাগের ফলে শ্রমিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে ব্যাপকভাবে। ১৯৭৮ সালে দেশ ছেড়ে চলে গেছেন প্রায় ৪০ হাজার, ১৯৭৩-এ এই সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার, '৭২-এ ছিল ১৬ হাজার, '৭১-এ ছিল ১২ হাজার, '৭০-এ ছিল ৭ হাজার। এই হারে চলতে থাকলে বর্তমান শতাব্দীর শেষে হয়তো দেখা যাবে দক্ষিণ আফরিকায় আর কোনো কৃষ্ণাঙ্গই নেই।

এই বর্বর অ্যাপারথিড প্রথার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রসংঘ ধিক্কার জানানো সত্ত্বেও এখানকার রাষ্ট্রপ্রধান ভরসটার কি করে এ প্রথা এখনও টিকিয়ে রাখতে পারছে?

দক্ষিণ আফরিকায় প্রচুর ভূ-সম্পত্তি ও সোনার খনি আছে বৃটিশ রাজপরিবারের। ফলে তাদের একটা সোজাসুজি স্বার্থ আছে এখানে শ্বেতাঙ্গ শাসন টিকিয়ে রাখার। উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফরিকা প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোগ করতে চায় মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জারমানি ও বৃটেন। তারাই ভরসটারের বর্ণবিদ্বেষী সরকারকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা পয়সা দিয়ে।

মেজর জেনারেল প্লিনসটার বলেছেন ঃ আমাদের জোয়ানরা সব আমাদেরই, কিন্তু অস্ত্রের জন্যে বাইরের ওপর ভরসা করতে হয়। তবে এই ভরসা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই আমরা নিজের দেশে এসব বানাবো।

দক্ষিণ আফরিকায় সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আসে নাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো থেকে। বৃটেন ওর নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াবার জন্য ৬টি ডেসট্রয়ার ও ফ্রিগেট দিয়েছে। তাছাড়া ফ্রানস আগেই দিয়েছে সর্বাধুনিক তিনটি সাবমেরিন। পশ্চিম জারমানি স্পিড-বোট তৈরির কারখানা খুলেছে ডারবানে। বৃটেন সিমোনটাউনে নৌ-ঘাঁটি তৈরি করেছে।

স্থলযুদ্ধের জন্য ফ্রানস দিয়েছে রকেটমুখী ফাইটার বোমবার। দক্ষিণ আফরিকার যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক ঘাঁটিগুলি পরিচালনার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বীটনকে সেখানে বহাল করেছে। ইতালি ওকে দিয়েছে ইমপালা যুদ্ধবিমান। এ যেন পৌরাণিক যুদ্ধের ঠিক বিপরীত। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে নানা দেবতা তাদের নিজস্ব অস্ত্র-গুলি দুর্গাকে দিয়েছিল আর এখানে পাশ্চাত্য দেশগুলি রাষ্ট্রসংঘের নীতির বিরুদ্ধতা করে দক্ষিণ আফরিকার ভরসটার সরকারকে সাজিয়ে তুলছে।

দক্ষিণ আফরিকার ভরসটার এখন আবার হাতে পেয়ে গেল পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির প্রযুক্তি কৌশল। আশংকা হয় এর পর কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়বে, বাড়বে নামিবিয়ার পরাধীনতার দিনও।

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন কোনো দেশেই থেমে থাকে না। দক্ষিণ আফরিকার স্বদেশ-প্রেমিক কৃষ্ণাঙ্গরা আফরিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, নামিবিয়াতে সোয়াপোর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম জাতিবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদ ও অ্যাপারথিডকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার জন্য। জিমবাবোয়ের স্বাধীনতা সেই প্রতিজ্ঞাকে আরও দৃঢ়মূল করেছে। ★

প্রধানমন্ত্রীর সামনে পর্বত-প্রমাণ সমস্যা

সুদীপ মজুমদার

সবেমাত্র ৫২টি আসনের ফলাফল জানা গেছে। প্রায় সব কটিই গেছে কংগ্রেস (আই) এর কবলে। জনতার পাত্তা নেই। লোকদল আর অন্যান্যরা কয়েকটি মাত্র আসন দখল করতে পেরেছে। কিন্তু এরই মধ্যে ১২ নম্বর উইলিংডন ক্রেসেনটের বাংলোবাড়িটার রূপ পালটাতে শুরু করে দিয়েছে। ভি আই পিদের সুরক্ষার জন্য যে বিশেষ পুলিশী বন্দোবস্ত তা সব পাকাপাকি হয়ে গেছে ও বাড়ির চৌহদ্দিতে।

সেদিনেরই বিকেলের কথা। কাতারে কাতারে মানুষ আসছিল ভাবী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে। বাগানের বড় গেট দিয়ে চলে যেতে হয় মানুষের ভিড়কে। কেন না বারান্দার সামনে জটলা করা বারণ। দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক আর ফটো-গ্রাফারদের অবশ্য বারান্দার কাছাকাছি যেতে দেওয়া হয়েছিল। বাগানে লোহার রেলিং দিয়ে একটা সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ওর একদিকে মানুষের ভিড়। অন্যদিকে ছোট একখানা মঞ্চ। মাঝে মাঝে ঘরের দরজা খুলে যাচ্ছিল শ্রীমতী গান্ধী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওই মঞ্চের ওপর আসছিলেন। দুহাত জড়ো করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন।

সারাদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও ভারতীয় কাগজের সাংবাদিকদের হতাশ হতে হল। অন্তত পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎকার, না, তাও না। শ্রীমতী গান্ধী সেদিন নারাজ ছিলেন দেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের উপর। বিদেশী সাংবাদিকরা অবশ্য টপাটপ ফটো তুলে যাচ্ছিল আর কয়েকটা মন্তব্যও আদায় করে নিয়েছিল।

এককোণে কিছু ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টার দাঁড়িয়েছিল। তাদের কিছু সরস তথ্য পরিবেশন করছিলেন এক অতিকায় চেহারার ভদ্রলোক। এর নাম কৌশল শর্মা। গত দু' বছরে শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতারত বেশির ভাগ ছবিরই পেছনে একে পাওয়া যাবে। পরনে পানজাবি পাজামা (খদ্দরের)। ওপরে জহর কোট। কপালে লাল টিপ। ঠোঁটের ওপরে পাকানো চওড়া গোঁফ। উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলার লোক। একবার এক সভায় শ্রীমতী গান্ধীকে নিজের বিশাল শরীর দিয়ে আড়াল করে ইট পাটকেল লাঠি থেকে তাকে বাঁচান। তারপর থেকে যেখানেই ইন্দিরা গান্ধী সেখানেই শর্মা। আজকাল শর্মা শ্রীমতী গান্ধীর দেহরক্ষী। শক্তি আর আকারের জন্য ওকে অনেকে ভীম বলে ডাকে।

সেই শর্মাই গল্প করছিলেন। বললেন, 'কাল যাচ্ছিলাম দিল্লি থেকে বুলন্দ শহরে নিজের ভোট দিতে। গাড়িটাতে কংগ্রেস-আই এর পতাকা লাগান ছিল। পথে জাঠেদের (চরণ সিংয়ের সমর্থক) রাজত্ব। দেখলাম গাড়িতে, বাড়িতে, জনতা আর লোকদলের পতাকা।'

শর্মা বলে চললেন, 'মনে মনে ভাবলাম আর একটা দিন মাত্র পতাকা উড়িয়ে নে, তারপর শুধু চারিদিকে ইন্দিরা গান্ধীরই পতাকা উড়বে। তখন দেখব ব্যাটারা কোথায় যাস।'

শর্মা হয়ত খুব একটা না ভেবে চিন্তেই কথাগুলো বলেছিলেন।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে শ্রীমতী গান্ধী দিল্লির টৌলভবনে এলেন বক্তৃতা দিতে। বললেন, 'যারা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে তাদের প্রতি দমন ব্যবস্থা আদৌ নেওয়া হবে না।' তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে ভাষণ শ্রোতারা আশা করছিলেন তা পেলেন না। ইন্দিরা গান্ধী, জনতা আর লোকদলকে কঠোর সমালোচনা করেই ভাষণের বেশির ভাগ সময়টা কাটিয়ে দিলেন। মনে হচ্ছিল প্রাক-নির্বাচনী ভাষণের অভ্যাস এখনও তার কাটেনি।

কদিন আগে জনতা পারটির নেতা অটল-বিহারী বাজপেয়ী অভিযোগ করেছেন—দিল্লির সরোজিনী নগরের বাসিন্দাদের নাকি ধমকান হচ্ছে; কেননা ওরা বেশির ভাগই জনতা পারটির সমর্থক। অবিশ্বাস আর ভয় ওদের ঘিরে ধরেছে। প্রায় একই অবস্থা কিছু সরকারী আমলা, বুদ্ধিজীবী আর সাংবাদিক মহলে।

গত কয়েক সপ্তাহে সরকারী রাজনৈতিক মহলে যে সব ইঙ্গিত দেখা গেছে তার সবকটাই কিন্তু সুখের নয়। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হবার পরে কেন ইন্দিরা গান্ধী প্রায় চারদিন ক্যাবিনেট ঘোষণা করলেন না এ নিয়ে অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা হয়। ওদিকে মন্ত্রিত্ব পাওয়ার আশায় উঠতি রাজনীতিবিদেরা সারি দিয়ে 'ক্ষমতাশালী' প্রভুদের দোরগড়ায় হাজির।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সঞ্জয় গান্ধী ও তার বন্ধু কমলনাথ যে প্রভূত ক্ষমতা-শালী তা অনেকেরই অজানা নয়। সেই জন্যই ক্যাবিনেট ঘোষণা হবার দুদিন আগে কমল নাথের ফ্রেনডস কলোনির বাড়িতে বিদ্যাচরণ শুক্লা ও বুটা সিং গিয়ে হাজির। শ্রীমতী



গান্ধীর পুরনো ও বিশ্বস্ত দুই অনুচর, যশপাল কাপুর ও আর কে ধাওয়ান, যারা এককালে বিস্তর কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, একেবারে মধ্যমণি হয়ে তার সেক্রেটারিয়েটে ফিরে এসেছেন। মন্ত্রীদের তালিকা তৈরি করার সময় বারবার এদের ডাক পড়েছে ইন্দিরা গান্ধীর কামরায়। কে কত বিশ্বস্ত তার সাক্ষ্য প্রমাণ এ দুজনের কাছে সুরক্ষিত আছে।

প্রথম খেপে যে মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করলেন তারা সবাই ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সন্দেহাতীত ভাবে অনুগত। তার চাই সংশয়হীন আনুগত্য। কেন না অতীতে অনেকেই পিঠে ছুরি বসিয়েছে। তাই যখন তালিকা প্রকাশ হয় আর বহুগুণার নাম খুঁজে পাওয়া যায় না তখন সবাই চমকে উঠলেও, যারা ইন্দিরা গান্ধীর কাছাকাছি ছিলেন তারা আশ্চর্য হননি। আগের দিন রাত্রে বহুগুণাকে ডেকে ইন্দিরা বলেন, 'পারটি সংগঠনের অবস্থা খুবই খারাপ; আপনি ছাড়া পারটির কাজ আর কে করতে পারবে বলুন?' শুনে বহুগুণা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে একমাত্র অতি বিশ্বস্ত ছাড়া অন্য কারও পক্ষে প্রথম খেপে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়।

বহুগুণা ছাড়া আর একজন কংগ্রেস-আই-এর নেতাও রেগে আছেন। তিনি হলেন ভগবত ঝা আজাদ। ইনি প্রায় দশ বছর আগে রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৪ জানুয়ারি সকাল সকাল টেলিফোন পেয়ে রাষ্ট্রপতি



ভবনে ছুটলেন ভগবত ঝা আজাদ। মনে আনন্দ। মন্ত্রিত্বের শপথ নেবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখলেন নিজের নাম রাষ্ট্র-মন্ত্রীর জায়গায়। আর নতুন লোক যেমন ভি পি শাঠে, নরসিংহ রাও আর শঙ্করানন্দ, এরা সব ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের তালিকায়। ভগবত ঝা আজাদ রেগে আগুন। সবাই এসে পৌঁছানোর আগেই সোজা বাড়িমুখো পাড়ি দিলেন।

এসব তো পুরনো কথা। সাধারণ ভোটার জানেন নেতা বা মন্ত্রীরা জনসাধারণের জীবনের সুখ-দুঃখের কোনও তোয়াক্কা করেন না।

নির্বাচনে জেতা এক জিনিস আর সুষ্ঠু রাজ্য শাসন করা অন্য জিনিস। প্রথমটা হলেই যে দ্বিতীয়টা আপনা আপনি হবে এমন কথা নয়।

ইন্দিরা গান্ধীর সামনে পাহাড়-প্রমাণ সব সমস্যা। গত কয়েক বছরে শিল্পের উন্নতির হার একেবারে বন্ধ। প্রচণ্ড খরা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দারিদ্র্যের গহ্বরে আরো ঠেলে দিয়েছে। দিনে দিনে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। জিনিসপত্রের দাম আগুন। ২০ শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে। রফতানি বাণিজ্য পতনের মুখে। প্ল্যানিং বলে কিছু নেই।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা বেড়েছে। কলকারখানার শ্রমিকরা এতদিন চুপ করেছিলেন। বাড়তি মজুরি বা ভাতার দাবি উঠছে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে বৈষম্য কখনো কখনো সংঘর্ষে পরিণত হচ্ছে। পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে অশান্ত এক পরিবেশ। সমস্যা অগুণতি।

কে রাখবে সরকারী কাজ বা গাফিলতির হিসেব নিকেশ? বিরোধীপক্ষের কী অবস্থা একবার দেখা যাক। কতটা কার্যকর হতে পারবে সেই বিরোধীপক্ষ যা নানান ছোট ছোট দলে বিভক্ত?

গত লোকসভায় কংগ্রেস-আই ১৫৪ জন সদস্য নিয়ে এক ফলপ্রসূ বিরোধীপক্ষ তৈরি করেছিল। কিন্তু এবার অবস্থা অন্য রকম। ৫২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস-আই পেয়েছে ৩৫১টি। অন্য সবাই মিলে ১৭৪টি। কিন্তু ১৭৪-এর মধ্যে ডি এম কে-র ১৬ জনকে না ধরাই ভাল; কেন না এদের কংগ্রেস-আই এর সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত ছিল। একই অবস্থা তিনজন ন্যাশানাল কনফারেনস ও তিনজন মুসলীম লীগের সদস্যের। আরও চার-পাঁচজন সদস্য যারা উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এসেছেন তারাও ইন্দিরার অনুগামী। বাকি রইল বাম ফ্রনটের ৫৩, লোকদলের ৪১, জনতার ৩১ আর কংগ্রেস (আরস)-এর ১৩। এছাড়া কয়েকজন নির্দলীয় আছেন। অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের সম্মিলিত শক্তি মাত্র ১৩৮।

জনতা আর লোকদল যে একতা রাখতে পারবে না তার ইঙ্গিত কয়েক সপ্তাহ আগে জনতা পারটির এক সভায় পাওয়া গেছে। চন্দ্রশেখর ও অটলবিহারী বাজপেয়ী ভাষণ দিচ্ছিলেন। একতার কথা আসতেই পারটির সমর্থকরা চিৎকার করে চরণ সিংয়ের লোকদলের সঙ্গে কোনরকম সমঝোতা করা চলবে না এ কথা জানিয়ে দেন। কংগ্রেস আই-এর বিজয়ের পেছনের মূল কারণ হিসাবে অনেকেই চরণ সিংয়ের দলত্যাগকে খুব গুরুত্ব দেন। কংগ্রেস (আরস) ১৩ জন সদস্য নিয়ে কিই বা বিরোধিতা করবে?

বাকি থাকে বাম ফ্রনট। নিয়ম অনুযায়ী লোকসভায় মোট সদস্যের দশ শতাংশ আসন থাকলে ও বিশেষ নির্বাচনী প্রোগ্রাম থাকলে বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে। বামফ্রনট এই নিয়ম অনুযায়ী একাই বিরোধী দল হতে পারে। এছাড়া লোকসভায় থাকবেন চরণ সিং, জগজীবন রাম, ওয়াই বি চ্যবন, অটলবিহারী বাজপেয়ী ও জর্জ ফার্নানডেজ।

যদিও বামফ্রনটের শক্তি বেড়েছে গত লোকসভার তুলনায়, কিন্তু আসলে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালার বাইরে কোথাও খুব একটা প্রভাব পড়েনি। শুধু বিহারে ও উত্তর প্রদেশে সি পি আই যথাক্রমে চারটি ও একটি আসন পেয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে কেন্দ্রে একটি দৃঢ় সরকার যে বসবে তার কোনও সন্দেহ নেই। বামফ্রনট বরাবরই বলে এসেছে রাজ্যকে আরও ক্ষমতা দিতে হবে। জ্যোতি বসু এই দাবিকে বার বার কেন্দ্রের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। জ্যোতিবাবুর দাবিকে, এ আই ডি এম কে, আকালী দল, ডি এম কে এমন কি শেখ আবদুল্লাও সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু অবস্থা পালটে গেছে। এরা কেউই আর আজ বামফ্রনটের সঙ্গে গলা মেলাতে লোকসভায় নেই। ইন্দিরা গান্ধীর মত ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রীর কাছে শক্তিশালী রাজ্য সরকার গ্রাহ্য হবে কি?

এছাড়া আরও একটা সম্ভাবনার কথা উঠেছে। কংগ্রেস-আই যেমন লোকসভায় আধিপত্য পেয়েছে রাজ্য সভায় তেমন অবস্থা নয়। রাজ্য সভাতেও একই অবস্থা আনার জন্য অ-কংগ্রেসী সরকার সরিয়ে কংগ্রেস-আইয়ের রাজ্য সরকার গড়া দরকার। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এমন একটি রাজ্য যেখানে কংগ্রেস-আই মাত্র চারটি আসন পেয়েছে। শক্তিশালী কেন্দ্রের কাছে বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গ চোখের বালি। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভার নির্বাচন করা দরকার। তার জন্য চাই বর্তমান বিধানসভা ভেঙে দেওয়া। তা কি করে হয়? উপায় আছে। রাজ্যে অবস্থার অবনতির অজুহাতে কেন্দ্র বিধানসভা ভেঙে দিতে পারে।

সব মিলিয়ে যে ছবি ফুটে ওঠে তা সকলের কাছে সুখকর নয়।

এবার ৩৫ কোটির কিছু বেশি ছিল ভোটারের সংখ্যা। তার মধ্যে মাত্র আট কোটি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস-আই। ১৫ কোটি ভোটার ভোটই দিতে যায়নি। তাই লোকসভায় ৩৫১টি আসনের মানে এই নয় যে দেশের সব লোক কংগ্রেস-আই-এর পক্ষে হয়ে গেছে।

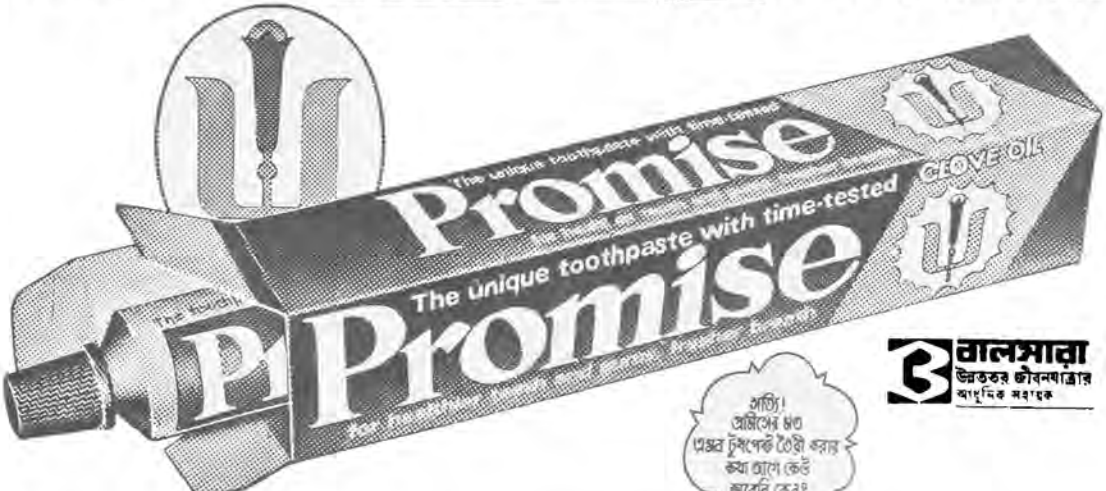
আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত। আট কোটি ভোটের জোরে কংগ্রেস-আই পেয়েছে ৩৫১টি আসন আর জনতা, লোকদল ও কংগ্রেস (আরস) মিলিত ভাবে ভোট পেয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি, কিন্তু আসন পেয়েছে ৮৫টা। সি পি এম ১৯৭৭-এর তুলনায় এবার প্রায় ৪০ লক্ষ ভোট বেশি পেয়েছে।

নির্বাচনী খেলার এ এক মজা। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কংগ্রেস-আইয়ের মাথা খারাপ করা ঠিক হবে না। বরং চেষ্টা করা উচিত, হাওয়া যেন আবার উল্টোমুখী হয়ে না যায়। ★

মনে আছে কি, ছোটবেলায় যখন দাঁতের যন্ত্রনা হ'ত,
তখন ঠাকুমা লবঙ্গের তেল লাগিয়ে কেমন তা সারিয়ে তুলতেন?
আপনার দাঁতের ডাক্তার আজও তা ব্যবহার করেন!

নতুন প্রমিস

এক অদ্বিতীয় টুথপেস্ট
যাতে আছে চিরকালের ব্যবহৃত লবঙ্গের তেল!

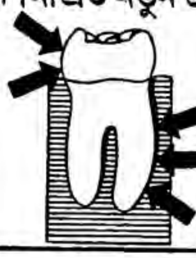


বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক



লবঙ্গের তেল মিশ্রিত নতুন প্রমিস টুথপেষ্ট

১.
দাঁতের ক্ষয়
নিবারণ করতে
সাহায্য করে।



২.
মুখের ভেতর
তাজা রাখার দরুন
নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ
হতে দেয় না।

সুস্থ সবল দাঁত ও মাড়ি
আর তাজা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে...প্রমিস!

"কেবলমাত্র কলকাতা ও হাওড়ায় পাওয়া যাচ্ছে।"

CHAITRA-BLS-369 BEN

প্রপারলি ড্রেসড

পি সি সরকার, জুনিয়র

কলকাতা, ২১ মে ১৯৭২

আমার যে এত মূল্য তা আমি গত বছরও বুঝতে পারিনি।

অবশ্য না বোঝার কারণও আছে। কারণ তখনও আমি ছিলাম ছাত্র—এম এস সি পড়ছি, ফাইন্যালে বসিনি, আর শুধু তা নয় তখনও আমি জাপানে গিয়ে ম্যাজিকের কাণ্ডারী হইনি। যদিও এই আমি আর সেই আমি একই ব্যক্তি—কিন্তু তবুও সেই গত বছরের আমার চেয়ে আজকের আমার আদরের পরিমাণটা অনেক অনেকগুণ বেশি।

মনে আছে, বছর দুই আগে, বাবার এক রোটারীয়ান বন্ধুর বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বাড়ির ড্রইংরুমে বসে চা-বিসকুট খেয়ে ফিরে এসেছিলাম। নিজেকে তাদের অন্তঃপুরে নিতেও পারিনি; প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু গত সপ্তাহে সেই একই ভদ্রলোক আমায় দেখে বললেন—"এই যে প্রদীপ, আসো না কেন বাড়িতে? সামনের শনিবার এসো—দুপুরে সবাই মিলে ডাল-ভাত খাবো..."

সত্যি কথা বলতে কি, ঐ 'ডাল-ভাত' খাবার নিমন্ত্রণ আমি বহু পেয়েছি এবং খেয়েছিও। কিন্তু সম্প্রতি এই 'ডাল-ভাতের' নিমন্ত্রণ ব্যাপারটা কেমন যেন বিশেষ রঙের বলে মনে হচ্ছে। খারাপ ব্যবহার আমি কখনও কারুর বাড়িতে আগেও পাইনি—এখনও পাচ্ছি না। বরাবরই আদরের সঙ্গে ডাল-ভাত খেয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি দেখছি—আদরের পরিমাণ এবং প্রকৃতিটা কেমন যেন পালটে পালটে যাচ্ছে...একেই বোধহয় 'জামাই আদর' বলে।

কিন্তু আমি তো জামাই নই—যে জামাই-আদর পাবো। ওঃ বুঝেছি—আমি জামাই না হতে পারি—কিন্তু তার চেয়ে এমন কিছু কম আদরণীয় নই। কারণ আমি এম এস সি-তে ভালভাবে পাশ করেছি বাবার আশীর্বাদে জাপানে গিয়ে একটু সুনাম কুড়িয়েছি; দু-পয়সা উপার্জনও করছি; বয়সে মোটেই বৃদ্ধ নই—এবং সর্বোপরি এখনও বিয়ে-শাদি করিনি।

এই ক'দিন আগে আমার ডাক পড়েছিল বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী মুখারজিবাবুর বাড়িতে। মুখারজিবাবু এবং তার ছেলে প্রচণ্ড ব্যস্ত লোক অফিসে ফেঁসে গেছেন। আসতে একটু দেরি হবে—এবং আমি যেন কিছু মনে না করি—সে কথা টেলিফোন করে লজ্জার সঙ্গে বলেছেন। আরও দু-তিনজনের নাকি নিমন্ত্রণে আসবার কথা। বাড়ি অবশ্য ফাঁকা নয়—মুখারজিবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ 'মাসীমা' আছেন আর তাছাড়া আছেন মুখারজিবাবুর ছোট মেয়ে—নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, ধরা যাক—'রত্না'।

এই রত্নাকে আমি আগে অনেকবার দেখেছি। কতো ছোট্ট ছিল। দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেছে। স্কুল-বাস থেকে নেমে বাসের বন্ধুদের হাত নাড়তো। বাস চলে যাবার পর ব্যাগ দুলিয়ে বাড়ি ফিরতো। এই রত্নাই এখন বি-এ সেকেনড ইয়ার-এর ছাত্রী। ইকনমিকস নিয়ে পড়ছে। সুন্দরী—হ্যাঁ খুবই সুন্দরী। এবং মাসীমা কথায় কথায় বলেছিলেন—ও নাকি দারুণ গানও গায়। সামনের টেবিলের ওপর ফ্রেমে একটা হাতে-আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল। তার তলায় বড় বড় করে রত্নার সইও ছিল। সেটা দেখে যে কেউই বলবে—রত্না ভাল ছবিও আঁকতে পারে।

রাতের খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। সুতরাং ঠাকুর-চাকরদের ইনসট্রাকশন দিতে মাসীমাকে বার বার রান্নাঘরে যেতে হচ্ছিল। আমি একা ঘরে বসে জীবনানন্দের বই পড়ছিলাম—নিজেকে ব্যস্ত রাখবার জন্য।



আমার এই বোরিং হবার ব্যাপারটা মাসীমা বুঝতে পেরে রত্নাকে খুব ধমকালেন। বললেন—"দেখছিস না প্রদীপদা বোর হচ্ছেন—তুই এসে একটু গল্প কর না।"

মায়ের খুব বাধ্য মেয়ে রত্না। জিব কেটে চুল ঠিক করে আমার সামনের সোফায় এসে বসলো। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা—নতুন চেহারায় আবির্ভূত হলেন চোখের সামনে।

* * *

বেশ কয়েকদিন পর আজ আবার এসেছি মুখারজিবাবুর বাড়িতে। একদম উপায় ছিল না—কারণ ইতিমধ্যে আমি রত্নার গান শুনেছি—প্রশংসা করে ফেলেছি—আর শুধু তা নয় বলে ফেলেছি রেকর্ড কোমপানি এই গলা শুনলে লাফিয়ে উঠবে। মাসীমার অনুরোধে ঠিক হয়েছে আজ রত্নাকে রেকর্ড কোমপানির এক কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। বাবা-মা সঙ্গে থাকলে ওর ট্যালেনট নাকি ঠিক প্রকাশ পাবে না—সুতরাং আমাকেই নিয়ে যেতে হবে।

কথামত ঠিক পাঁচটার সময় আমি এসেছি। দেখি রত্না তখনও রেডি হয়নি। একটা কাফতান পরে ড্রইং রুমে বসে গুনগুন করে গান গাইছে আর চুল আঁচড়াচ্ছে। আমাকে দেখেই গান বন্ধ করে চমকে উঠলো—"আরে! প্রদীপদা, পাঁচটা বেজে গেছে নাকি!?"

ও খেয়ালই করেনি—অজান্তেই ঘড়ির কাঁটা দুটো গুটি গুটি এগিয়ে পাঁচটা বাজিয়ে দিয়েছে। "সরি, একটু বসো—আমি এক্ষুণি শাড়ি পরে আসছি।"

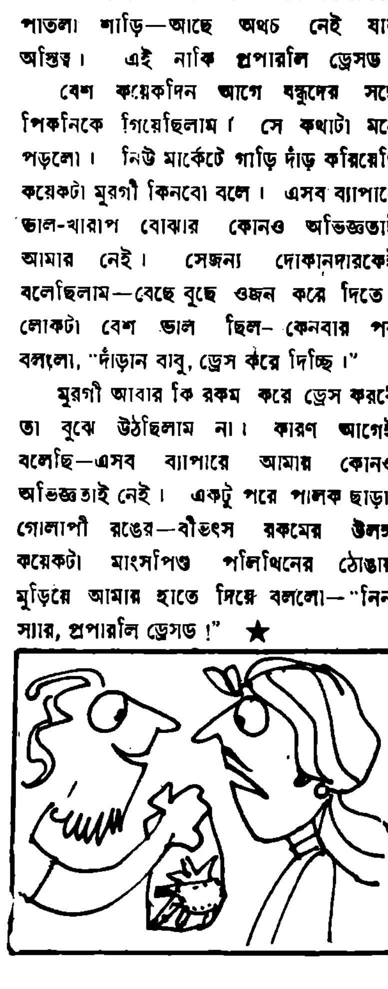
ওর গায়ের জামাটা কিন্তু মন্দ ছিল না। বেশ দামী আর জমকালো একটা কাফতান। বললাম—"এই পোশাকেই তো যাওয়া যায়, চমৎকার জামাটা। আর তাছাড়া ভদ্রলোককে অপেক্ষা করানো ঠিক হবে না।"

রত্না কথা বাড়ালো না, বললো—"এক মিনিট লাগবে—এটা পরে ওখানে যাওয়া যায় নাকি? আমি প্রপারলি ড্রেস করে আসছি।"

মিনিট পনের পর রত্না সেজেগুজে এলো। চমকে উঠলাম আমি। এই নাকি ড্রেস!! সর্বাঙ্গ ঢেকে পর্দানশীন সেজে কাফতান পরে ও বাড়িতে বসেছিল। আর এখন বাইরে যাবার সময় সেই আবরু কোথায় গেল? হাত কাটা, পেট কাটা সর্বত্র-কাটা স্বল্পতম কার্পাসের তৈরি ঐ ব্লাউজকে তো অন্তর্বাসই বলা ঠিক হবে। আর তার ওপর ফিনফিনে পাতলা শাড়ি—আছে অথচ নেই যার অস্তিত্ব। এই নাকি প্রপারলি ড্রেসড?

বেশ কয়েকদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গিয়েছিলাম। সে কথাটা মনে পড়লো। নিউ মার্কেটে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি কয়েকটা মুরগী কিনবো বলে। এসব ব্যাপারে ভাল-খারাপ বোঝার কোনও অভিজ্ঞতাই আমার নেই। সেজন্য দোকানদারকেই বলেছিলাম—বেছে বুছে ওজন করে দিতে। লোকটা বেশ ভাল ছিল—কেনবার পর বললো, "দাঁড়ান বাবু, ড্রেস করে দিচ্ছি।"

মুরগী আবার কি রকম করে ড্রেস করবে তা বুঝে উঠছিলাম না। কারণ আগেই বলেছি—এসব ব্যাপারে আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। একটু পরে পালক ছাড়া, গোলাপী রঙের—বীভৎস রকমের উলঙ্গ কয়েকটা মাংসপিণ্ড পলিথিনের ঠোঙায় মুড়িয়ে আমার হাতে দিয়ে বললো—"নিন স্যার, প্রপারলি ড্রেসড!" ★



ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ



১৯৬৪ সালে বহু ঘটা করে যখন ভারতীয় খাদ্য করপোরেশন তৈরি করা হয়েছিল তখন কে ভেবেছিল খাদ্য নিয়ে বেসরকারী পুঁজি-পতিদের মজুতদারি ও মুনাফাবাজি রুখতে গিয়ে এমন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হবে যেখানে চলবে দেশের গরীব মানুষের কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? কে ভেবেছিল এক মনোপলি ভাঙতে গিয়ে আর এক জব্বর মনোপলির সৃষ্টি হবে? কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য লোপাট হয়ে যাবে, না হয় গুদামে পচবে? কোটি কোটি টাকা সরকারী ভরতুকি দেওয়ার পর এফ সি আই রেশনে যে চাল জনসাধারণের মুখে তুলে দেয় তা হয় পচা নয়তো অখাদ্য। অথচ ভিয়েতনামে খয়রাতি ও বাংলাদেশে লোন বাবদ যে চাল পাঠানো হয়েছে তা ভারত-বাসীরা যে চাল খায় তার তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের। এ দেশে রেশনে চালের নামে যে বস্তু দেওয়া হয় তা অতি বড় গরীব দেশও ভিক্ষা হিসাবেও নিতে রাজি হবে কি না সন্দেহ।

১৯৬৪ সালে লোকসভায় এফ সি আই বিল আনা হয়। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—এফ সি আই হবে পুরোপুরি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সে সরাসরি বাজার থেকে ধান চাল কিনবে। এর ফলে পাইকার বা ফড়িয়াদের শোষণ বন্ধ হবে চাষীরা ন্যায্য মূল্য পাবে। দেশব্যাপী গড়ে উঠবে বাফার স্টক বা আপৎকালীন মজুত।

এফ সি আই সে প্রতিশ্রুতি কতখানি পালন করতে পেরেছে?

১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এফ সি আইকে ২০৪৪ কোটি ভরতুকি দিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা এসেছে সাধারণ মানুষের পকেট থেকেই। একদিকে এই ভাবে সরকারী টাকা আসছে, অন্যদিকে এফ সি আইতে গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

১৯৭৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এফ সি আই এর চেয়ারম্যান আর এন চোপরা ফুড করপোরেশনের জনৈক পদস্থ অফিসারকে লেখা একটি গোপন চিঠিতে (ডি ও নং পিএস/সি এইচ/এফ সি আই/টি এস এল ৭৭) স্বীকার করেন যে দশ বছরে (১৯৬৭-১৯৭৭) এফ সি আই এর অপচয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, যার বাজার দাম ১৫০ কোটি টাকার উপর। এইসব অপচয় হয়েছে গুদাম থেকে, ও পরিবহণের সময়।

চোপরা সাহেব এফ সি আইকে নির্দেশ দেন স্টোরেজ লসের পরিমাণ একেবারে খাতা থেকে 'রাইট অফ' করে দিতে। অর্থাৎ যা গিয়েছে যাক।

মজা হল—বিভিন্ন গুদাম থেকে কোটি কোটি টাকার যে খাদ্যশস্য হয় পাচার হয়ে গিয়েছে না হয় পচে গিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আর কোন তদন্তই হয়নি। চোপরা সাহেব তার ওই চিঠিতে লিখছেন 'হাজার হাজার কেস জমে স্তূপাকার হয়ে আছে। প্রয়োজনীয় খবরা-খবরের অভাবে এসব কেস নিয়ে আর ঘাঁটা-ঘাঁটি হয়নি। কখনও কুঁড়েমির জন্য, কখনও দেখাশোনার অভাবের জন্য, কখনও বা ক্ষয়-ক্ষতি চাপা দেবার জন্য, এসব কেস নিয়ে কেউ নাড়াচাড়া করেনি।' চোপরা সাহেব তাই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তদন্তের নির্দেশ দেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব কেস 'রাইট অফ' করতে বলেন।

গুদামজাত অবস্থায় এবং যাতায়াতের পথে এফ সি আই এর খাদ্যশস্য অপচয়ের মোট পরিমাণ গত বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল ৬০০ কোটি টাকায়। এর মধ্যে ৩৯০ কোটি টাকা আগেই 'রাইট অফ' করে দেওয়া হয়েছিল। চোপরা সাহেব বাকি ২১০ কোটি টাকা মকুব করে হাত ধুয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়ে-ছিলেন। তার নির্দেশ মতই এখন কাজ চলছে।

ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ	ঃ কোটি টাকার হিসাব
	ট্রানজিট লস	স্টোরেজ লস

	ট্রানজিট লস	স্টোরেজ লস
উত্তরাঞ্চল—	১২·৩১	১২·২৩
দক্ষিণাঞ্চল—	১৫·২৭	১৫·৯৭
পশ্চিমাঞ্চল—	১৮·৮১	১৬·০০
পূর্বাঞ্চল—	১৯·৩৯	৪২·০৩
	৬৫·৭৮	৮৬·২৩

গৌরী সেনের টাকা

এফ সি আই এর টাকা সম্পর্কে এজেনট ও মিলারদের ধারণা ওটা স্রেফ গৌরী সেনের টাকা সুতরাং কোন হিসাব না দিলেও চলে। ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে এফ সি আই মিল এজেনট ও কো-অপারেটিভকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও চাল তৈরির ভার দিয়েছিল কিন্তু তার জন্য কোন সিকিউরিটি নেয়নি। এজেনটরা চাষীদের কাছে ধান চাল কেনার জন্য এফ সি আই এর কাছ থেকে মোটা টাকা অগ্রিম নিয়েছিল। কথা ছিল ধান চাল সংগ্রহ হয়ে গেলে কমিশন কেটে রেখে কেনা খাদ্যশস্য তারা এফ সি আই এর গুদামে তুলে দেবে। মিলগুলির সঙ্গে চুক্তি হয় তারা ধান নিয়ে চাল করে দেবে। এর জন্য এফ সি আই তাদের মজুরি দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বহু এজেনট অগ্রিম টাকা নিয়ে আর ধান দিল না। মিলে যে ধান পেল তা আর চাল হয়ে ফিরে এলো না। অডিট চেপে ধরতে পারে এই আশংকায় এফ সি আই ওই সব অসাধু এজেনট ও মিলারদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল। কিন্তু কিছু হল না। কারণ এসব ব্যাপারে আগে থেকে কোন লিখিত চুক্তিই হয়নি। প্রমাণের অভাবে মামলা ফেঁসে গেল। আসলে সব জেনে শুনেই কিছু অফিসার অসাধু এজেনট ও মিলারদের হাতে কোটি কোটি টাকার ধান চাল তুলে দিয়েছিল।

এই ভাবে মাত্র চারটি রাজ্যে এফ সি আই এর কত টাকা মার গেছে তার একটা হিসাব তুলে দিলাম যা পড়ে যে কোন লোকই চমকে উঠবেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন মিল ও সমবায় সমিতির কাছে পাওনা	২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
আসামের মিল সমিতি ও গুদাম এজেনটদের কাছে পাওনা	১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা
ওড়িশায় পাওনা	৯৮ লক্ষ টাকা
বিহারের পাওনা	৩৬ লক্ষ টাকা
	মোট ৫ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা

না, এজেনটদের কাছ থেকে সিকিওরিটি ডিপোজিট এফ সি আই একেবারেই নেয়নি একথা বললে ভুল হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়েছে। যেমন আসামে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মাল দিয়ে ডিপোজিট রেখেছে ৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। ওড়িশায় ৯৮ লক্ষ টাকার মালের বদলে জামানত রেখেছে ৩ লক্ষ টাকা। উদার বটে এফ সি আই!

গ্রহ বাহ্য

মিল মালিক ও বেসরকারী পুঁজিপতিদের প্রতি এফ সি আই এর 'উদারতার' অনেক প্রমাণ আছে। এমন বহু তথ্য আছে যার

দ্বারা প্রমাণ হবে এফ সি আই এর টাকায় কি ভাবে লাল হয়ে উঠছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। কতগুলি উদাহরণ :

এক : ১৯৭৪-৭৫ সালে এফ সি আই এর মজঃফরপুরের জেলা ম্যানেজার বিহারের ১৮টি চিনি কলকে লেভির চিনি কেনার জন্য ৭৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। সব রকম আর্থিক নিয়ম লংঘন করে ওই টাকা দেওয়া হয়েছিল। ও টাকা আর আদায় হয়নি। অডিট বার বার আপত্তি তুলেছে কিন্তু কে শোনে সে কথা।

দুই : ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭২-৭৩ সালের মধ্যে বিহারের সরকার এফ সি আই এর পশ্চিমবঙ্গ অফিসের কাছ থেকে এক কোটি টাকার ভুট্টা কেনে। বিহার কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছিল পারচেজিং এজেনট। এই টাকাটা এফ সি আইকে নগদে মিটিয়ে দেবার কথা ছিল। চুক্তি হয়েছিল ওই সমবায় সমিতি এক কোটি টাকার ড্রাফট ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দেবে। কিন্তু দেখা গেল সমিতি ৩৬ লক্ষ টাকা জমা দেয়নি। এক কোটি টাকার মাল আগেই ডেলিভারি হয়ে গিয়েছে। এই ৩৬ লক্ষ টাকা কে মাঝপথ থেকে মেরে দিল তা জানবার জন্য সি বি আই তদন্ত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাওয়া যায়নি বলে সি বি আইও বেশিদূর এগুতে পারেনি।

তিন : ঠিকাদারদের স্বর্গ এফ সি আই। এফ সি আই এর কাজ থেকে কম কাজ করে বেশি টাকা আদায় করা আজ এক স্বাভাবিক ঘটনা, এ নিয়ে অডিট রিপোরটে বহু কেলেংকারির কথা প্রতি বছর ফাঁস হয়ে থাকে। এই সব অডিট অবশ্য আভ্যন্তরীণ অডিট—পাবলিক জানতে পারেন না। গৌহাটি অফিসের এমন এক গোপনীয় আভ্যন্তরীণ অডিটের সর্বশেষ রিপোরট (অডিট সেল ১৮২৭ / ৭৮ /১২ মারচ /১৯৭৯) থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

আসামে ১৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল এফ সি আই এর মাল লোডিং আনলোডিং করা। এতে দেখা যাচ্ছে এফ সি আই-এর যে নির্ধারিত রেট তা থেকে এদের ৮৯,১৪৪ টাকা ৩১ পয়সা বেশি দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের অডিটে (ভাউচার নং ১৩৯/. ২-৫-৭৭ ও ভাউচার নং ১২৮১/২৮-১১-৭৭) দেখা গেছে দুজন ঠিকাদারকে মাল পরিবহণের জন্য ৯৩ হাজার ২২২ টাকা ১৭ পয়সা বেশি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। অডিট ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওই টাকা ফেরৎ চাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই দুই ঠিকাদারই হিসাবের কারচুপি করে বেশি রেট দেখিয়ে বেশি টাকা আদায় করে নিয়েছে।

ঠিকাদাররা এফ সি আই থেকে দরকার মত অগ্রিম পায়। কিন্তু যখন বিল আদায় করে তখন ওই অগ্রিম টাকা কাটা যায় না। আসামের দুজন ঠিকাদার পি কে আগরওয়াল ও রামানন্দ সিং যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ২ হাজার ২৩০ টাকা অগ্রিম নিয়েছিলেন। কিন্তু বিল মেটানোর পর ওদের দুজনের কাছেই ১৭,২৩০ টাকা অগ্রিম নেওয়া টাকা থেকেই গেল, কারণ ওরা যে অগ্রিম নিয়েছিলেন যেসব কাগজপত্র নাকি অফিস থেকে উধাও। আবার আর একটি কেসে ঠিকাদার পি কে আগরওয়ালাকে ৩২ হাজার টাকা ও কে পি মজুমদারকে ৩২ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল। আগরওয়ালার কাছে ১৯৭৭ সাল থেকে অগ্রিম দেওয়া পড়ে আছে। মজুমদারের কাছে পড়ে আছে ৬ হাজার টাকা। নিয়ম হল শতকরা ৫০ ভাগের বেশি অগ্রিম দেওয়া যায় না এবং এক বছরের বেশি অগ্রিম টাকা ফেলে রাখা যায়না। কিন্তু ঠিকাদারদের প্রতি দরদবশত এফ সি আই ৭০ থেকে ৯০ ভাগ টাকা অগ্রিম দিচ্ছে ও বছরের পর বছর সে টাকা নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না।

দরিয়ামে ডাল

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় এফ সি আই ভারত সরকার মারফৎ বাংলাদেশকে ২৫ কোটি টাকারও বেশি খাদ্যশস্য পাঠিয়ে দেয়। ওই টাকার মধ্যে ২১ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। কিন্তু ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার আজও কোন হদিশ নেই। কারণ ওই পরিমাণ খাদ্যশস্যের 'কনসাইনি রিসিপট' অফিসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। এফ সি আই-এর গুদাম থেকে ২৫ কোটি টাকার মাল গিয়েছে। কিন্তু ৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মাল যে কে গ্রহণ করেছে তার ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছেনা। এখন ধরে নেওয়া হচ্ছে এই মাল বাংলাদেশে আদৌ যায়নি, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতায় মাঝপথ থেকেই লোপাট হয়ে গিয়েছে।

এফ সি আই এর মাল জাহাজ ও ওয়াগন থেকেও উধাও হয়ে যাচ্ছে ম্যাজিকের মত। যত মাল এফ সি আই জাহাজে চাপালেন খালাশ করতে গিয়ে দেখা গেল ২ কোটি টাকার মত মাল শরট। এফ সি আই জাহাজ কোমপানি ও এজেনটদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করল। বাস, ওই পর্যন্তই।

এইভাবে খাদ্যবাবদ এফ সি আই-এর ক্ষতিপূরণ দাবির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায়।

সার বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবি ১ কোটি ৯ হাজার টাকা। কলকাতা বন্দরের কাছে এফ সি আই এর ক্ষতিপূরণ পাওনা ১৭ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৫ টাকা ৬০ পয়সা। এ টাকা এখনও অনাদায়ী।

এফ সি আই যেন টাকার থলি নিয়ে বসে আছে হরিলুটের মত বিতরণের জন্য। কলকাতা বন্দরকেই এফ সি আই ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এক কোটি টাকা গুনগার (ডেমারেজ) দিয়েছে।

কেন এই গুনগার? না 'অপদার্থতা ও অকর্মণ্যতার' জন্য এফ সি আই বন্দরের গুদাম থেকে নির্ধারিত সময়ের ভেতর মাল খালাশ করতে পারেনি। অনেক সময় পরিবহণ ঠিকাদারদের গাফিলতিতেই এটা হয়েছে। কিন্তু দায়ভাগ বহন করেছে এফ সি আই। কী পরিমাণ ডেমারেজ তাদের গুনতে হয়েছে একবার দেখুন।

পণ্য	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭
খাদ্যশস্য	টাকা—৫,৪২,৯০৮'০৫	টাকা—৩,১৬,০৯৫'৫৭
দানকরা দ্রব্য	৩৭,০১,৬৩১'২৭	১২,৩০,৮৩০'৩০
সার	২২,১৪,২০১'১২	১২,৩০,৭৪৭'২৪
	টাকা—৬৪,৫৮,৭৪০'৪৪	টাকা—২৭,৭৭,৬৭৩'১১
মোট—৯২,৩৬,৪১৩'৫৫ টাকা		

শুধু জাহাজ কেন রেলকেও কি এফ সি আই ডেমারেজ বাবদ কম টাকা পাইয়ে দিয়েছে? ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত পূর্ব রেলকে দিয়েছে ৩১ কোটি টাকার ডেমারেজ। কারণ ওয়াগন থেকে তারা মাল খালাশ করতে পারেননি। অন্যদিকে রেলের কাছ থেকে এফ সি আই যে ১৮ কোটি টাকা ক্লেম করেছিল সে টাকা আদায় করতে পারেনি। ওই টাকাটা কোথাও আনডার লোডিং বাবদ, কোথাও বা রেল ভাড়া দুবার কেটে নেওয়া বাবদ কোথাও বা নিয়ম বিরুদ্ধ ভাবে রেল বেশি ভাড়া নিয়েছে বলে।

এমনকি সরকারও

এফ সি আই এর টাকা শোধ না করলেও চলে এমন ধারণা সর্বত্র। এমনকি বিভিন্ন রাজ্য সরকারও এফ সি আই এর পাওয়া টাকা শোধ করে না। শুধু পূর্বাঞ্চলেই বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের কাছে এফ সি আই এর ৬৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়ে আছে।

বিহার সরকার—	২৩'৭৮ কোটি টাকা
ওড়িশা—	৮'২৬ "
পশ্চিমবঙ্গ—	৭'২৫
আসাম—	০'৬৪
(১৯৭৮ পর্যন্ত হিসাব) মোট	৩৯'৯৩ কোটি

এফ সি আই কর্মী-সংখ্যা

(সারা ভারত)

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী	৪৭,৭৩৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	২,০৪৬
প্রথম শ্রেণী	৭৪১
মোট	৫০,৫২২

(সূত্র : বার্ষিক রিপোরট ১৯৭২-৭৩)

বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছে পাওয়া ৬৫ কোটির মধ্যে ২১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা পড়ে আছে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে বিহার সরকারের কাছেই।

১৯৭৪-৭৫ সালে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে এফ সি আই ধারে মাল দেয়। মাল ডেলিভারির পর বিল পেশ করার কথা। এফ সি আই কর্তৃপক্ষ জেলা অফিসগুলিকে লিখল তাড়াতাড়ি বিল বানিয়ে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু অ্যাকাউনট অফিসারদের বছর হয় আঠারো মাসে। এছাড়া ঠিকাদার ও এজেনটদের অশুভ লবি এইসব অ্যাকাউনটস অফিসে অত্যন্ত সক্রিয় দিচ্ছি দিচ্ছি করে তারা বিল দিতে দেরি করতে লাগলেন। এর ফলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এক কোটি দশ লক্ষ টাকার মত শুধু সুদই নষ্ট করলেন এফ সি আই।

আরও কাহিনী

১৯৭৫ সালে মেদিনীপুরে এফ সি আই এর খাদ্য গুদামে রহস্যজনক ভাবে আগুন লাগে। ৩ লক্ষ ৫১ হাজার টাকার খাদ্যশস্য পুড়ে যায়। ভাবতে পারেন ওই অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে আজও কোন তদন্ত হয়নি!

এফ সি আই যাতে হাত দিচ্ছে তাতেই টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে। ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে এফ সি আই বহরমপুর ও খুরদা রোডে দুটো ওয়েব্রিজ বানাল। ১৯৭৫ সালে খুরদা রোডের ওয়েব্রিজের কাজ শেষ হয়। খবর গত বছর পর্যন্ত ওই ওয়েব্রিজ চালু হতে পারেনি কারণ যে যন্ত্রপাতি ওতে লাগানো হয়েছে তা নিকৃষ্ট ধরনের। তা দিয়ে কাজ হয়না। ১৯৭৬ সালের ২৩ ফেবরুয়ারি বহরমপুরের ওয়েব্রিজটির কাজ শেষ হয়। ওখানেও দেখা যায় ওজন যন্ত্রটি ত্রুটিপূর্ণ। ফলে ওয়েব্রিজ কোন কাজে আসেনা। একেতো ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি, তার উপর ১২ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে যায়।

আর একটি উদাহরণ: এফ সি আই ধান ভানার জন্য ৯টি রাইস মিল তৈরি করল। এগুলি বসল দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, বুদ্ধিপুর, চম্পাটিয়া, হীরাকুদ, দুর্গারিপলি, হোজাই, উত্তর লখিমপুর ও মণিপুরে।

আধুনিকতম মিল—তাই কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কেনা হল। প্রত্যেক মিলের ক্ষমতা ঘণ্টায় ৩ মেঃ টন ধান ভানা। ৯টি মিল ঘণ্টায় ৬৪৮ মেঃ টন করে ধান ভানবে এটাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু মেশিন চালাতে গিয়ে দেখা গেল সব রদ্দি মাল। ২৪ ঘণ্টা যেখানে মিল চলার কথা সেখানে কোন মিলই দিনে ৪ ঘণ্টার বেশি চলছে না। ধান ভানার খরচ সর্বত্র কেজি প্রতি ৫০ পয়সা। কিন্তু এফ সি আই এর মিলে তার খরচ ৬ থেকে ১২ টাকা।

ওয়াগন ফিরে এসো

ওয়াগনরা যদি মানুষ হতো তাহলে এফ সি আই হয়ত তাদের শত শত হারানো ওয়াগন সম্পর্কে 'ফিরে এসো' বলে বিজ্ঞাপন দিতে পারত। এফ সি আই এর ওয়াগনে মাল ভরতি হয়, কিন্তু প্রাপকের কাছে গিয়ে পৌঁছয় না—এমন বহু ঘটনার উদাহরণ আছে। এইভাবে বছরে ৪ কোটি টাকার খাদ্য বোঝাই ওয়াগন উধাও হয়ে যায়। শুধু ১৯৭৫-৭৬ ও ১৯৭৬-৭৭ সালের নিখোঁজ এফ সি আই ওয়াগনের এবং ওইসব ওয়াগনে কত টাকার মাল ছিল তার হিসাব দিচ্ছি পরে।

অবশ্য ওয়াগন বোঝাই খাদ্যশস্য সচল। তাদের চাকা আছে। তারা খুশিমত গন্তব্যস্থল বেছে নিতে পারে। কিন্তু অচল অনড় ভারি ইসপাতও এফ সি আই জোনাল অফিসের গুদাম থেকে উধাও হয়। ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার



গৌহাটি—	টাকা ১,৬৩,৭৭,৯৫৮'৮৬
জোড়হাট—	১,১১,০৯,৪৩৩'০৬
উত্তর লখিমপুর—	৪২,৪৮৯'৪০
নওগাঁ—	২৩,৭২,৭৫২ ৫৩
শিলচর—	১,৩৩,৭২,৩৯৮'৩৩
কোকরাঝর—	৩৭,৭৩১'৩২
বালিচক—	৫১,২৩৯ ৭০
শ্রীরামপুর—	৬৭,৪২০'০০
উত্তর কলকাতা—	২৫,০৪ ৫৩৪'৭০

৫৩৯ টাকা ৪৫ পয়সা দামের ইসপাতও এই ভাবে অদৃশ্য হয়েছে। পরপর তিনবছর খাতায় কলমে দেখানো হয়েছিল এই ইসপাত গুদামে রয়েছে। অথচ তার আগেই গুদাম সাবাড় হয়ে গিয়েছিল।

এফ সি আই এর পূর্বাঞ্চল

এবার এফ সি আই এর পূর্বাঞ্চল অফিসে কী ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে একটু দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে যে এফ সি আই ভাড়া নিতে খুবই পছন্দ করে। ওরা ভাড়া বাড়িতে থাকে, মোটা টাকা গুদাম ভাড়া দেয়। নিজস্ব কিছু তৈরিতে ওদের আস্থা কম।

কলকাতায় ১০ মিডলটন স্ট্রীটে এফ সি আই এর অফিস। ওই অফিসে ধরে না বলে কলকাতায় আরও কয়েকটা অফিস আছে। সব মিলিয়ে ওরা মাসে এক লাখ টাকা বাড়ি ভাড়া দেয়। কয়েক বছর আগে ডালহৌসি স্কোয়ারে এক বাড়ির মালিক এফ সি আইকে বললেন আমাদের অফিসটি কিনে নিন ন' লাখ টাকা দিয়ে। ওখানে আপনাদের নিজস্ব বাড়ি করুন। আর ৫৫ লাখ টাকা দিলেই তখন এফ সি আই এর নিজস্ব বিরাট অফিস বাড়ি হয়ে যেত। এই টাকা সাত বছরের বাড়ি ভাড়ার সমান। ফলে এফ সি আই এখনও ভাড়া গুনছে। তেমনি নিজস্ব গুদামের বদলে সাঁখরাইলে মাসে এক লাখ টাকা দিয়ে গুদাম ভাড়া নিয়েছে এফ সি আই। এই ভাড়া নেওয়ার আগে টেকনিক্যাল সার্টিফিকেটও নেয়নি—গুদামটা চলবে কিনা তা দেখা হয়নি। ফলে ওই গুদামে বৃষ্টির জলে দু' লক্ষ দশ হাজার টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে। আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে এক লক্ষ দশ হাজার টাকার খাদ্যশস্য।

হাওড়ার বেঙ্গল জুট মিলের আর একটি গুদাম ভাড়া নিয়েছে এফ সি আই। ভাড়া মাসে ৬০ হাজার টাকা। এই গুদামের অবস্থা এত খারাপ যে এখানে ১৯৭৬-৭৭ সালের বৃষ্টিতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার খাদ্যশস্য নষ্ট হয়েছে।

বেহালায় শেডও ভাড়া নিয়েছিল এফ সি আই। ভাড়া গুনে ছিল ২ লক্ষ টাকা। অডিটে আপত্তি হওয়ায় অবশেষে ছেড়ে দিয়েছে। ওই শেডের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ।

বিহারের ছাপরাতে একটি ছোট্ট শেড



ভাড়া নিয়েছিল এফ সি আই। মাসে ৩৫০ টাকা ভাড়া। কিন্তু এ পর্যন্ত দশ হাজার টাকা ভাড়া, গুনে দিলেও একদিনও শেড ব্যবহার করা হয়নি। বিহারে এমন আরও চারটে গুদামের জন্য ১০ লক্ষ টাকার উপর ভাড়া গুনেও এফ সি আই সেগুলি ব্যবহার করেনি।

১৯৭০ সালে কলকাতার জগন্নাথ ঘাটেও একটি গুদাম এফ সি আই ভাড়া নেয়। এ পর্যন্ত সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ভাড়া গোনা হয়েছে। কিন্তু গুদামটি ব্যবহারের এত অযোগ্য যে ওটি খালিই ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে।

স্যাক রেস

বস্তার দৌড়ে বস্তাগুলির মধ্যে আগে বাড়ার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এফ সি আই-এর খাদ্য বোঝাই বস্তাগুলিকে ওই প্রতিযোগিতায় দিলে তারা নিশ্চয়ই পুরস্কার পেত। মাল খালাশের পর এই সব বস্তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। এইভাবে স্টিভেডরদের কাজ থেকে এফ সি আই-এর ২৫ লক্ষ বস্তা প্রতি বছর অদৃশ্য হচ্ছে। আর সেগুলো এফ সি আই ফিরে পায় না। ওই বস্তার দাম হবে ১ কোটি টাকা।

অপচয় চলছে. চলবে

এফ সি আই যা শুরু করে হাজার সমালোচনা হলেও তা থেকে বিরত হয় না। —জন্ম থেকে যে কোটি কোটি টাকার অপচয় এফ সি আইতে হয়ে আসছে তা আজও অব্যাহত আছে। প্রতি বছর অডিট রিপোরটে এই সব অপচয় সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করা হচ্ছে। কিন্তু এফ সি আই-এর বক্তব্য 'গোলা খা ডালা'! ধরুন পূর্বাঞ্চলের কলকাতা অফিসের কথা। ওদের গোপন ইনটারন্যাল অডিট রিপোরটের পাতাগুলিতে একবার চোখ বোলান [এ সি (ওয়ান) ১৮৮২/৭৯ জে এম (পিও) ৩১.৭.৭৯]। অপচয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকাটি একবার দেখুন:

১। ভেজা ময়দা বিক্রির ব্যাপারে অনিয়ম। এর দরুন ক্ষতি ২৬,৭৬৭ টাকা।

২। এ আর ডি সি গুদাম ও অন্য গুদামে স্টোরেজ স্পেসের অভাব। এর ফলে ১২,০৩,৬৮৫ টাকা বাড়তি খরচ।

৩। বিদেশগামী জাহাজে মাল তুলতে দেরি করায় ১,০৪,০১৪.৬২ টাকা ডেমারেজ ও ২০,৩০৯.৭৩ টাকা অতিরিক্ত পোরট চারজ।

৪। ১৯৭৭-৭৮ ও ১৯৭৮-৭৯ সালে কলকাতা বন্দরে ভেড়া সরবাহকারী জাহাজ থেকে মাল নামাতে দেরি করায় ১,১৪,৬৭,৫১২.১০ টাকা ডেমারেজ চারজ।

৫। পলিহিমনিয়া জাহাজের সঙ্গে ৮৬,৪৬,২৫৩.৫২ টাকার ক্লেম দীর্ঘদিন ধরে বাকি পড়ে আছে। বাকি পড়ে আছে কলকাতা বন্দরের কাছে ৫২,৮৯০.৬০ টাকার ক্লেম।

৬। জে জে পি ও বি কে এন ডিপোকে দিতে হয়েছে ৬০,২৫ ৪৩৮.৯৭ ও ৭,৬৬.৬২৩.৮৮ টাকার ডেমারেজ।

৭। বি জে এম গুদামের গাফিলতির জন্য ১৮,৭৮৭.০৫ টাকার ক্ষয়ক্ষতি।

অখাদ্য চাল

এফ সি আই-এর মাধ্যমে ভারত সরকার পানজাব হরিয়ানার স্বার্থে জনসাধারণকে খাওয়াচ্ছেন অখাদ্য চাল। আইন অনুসারে এফ সি আই চাষীর উদ্বৃত্ত ধান গম কিনতে বাধ্য। ভারত সরকারের নতুন স্পেসিফিকেশন অনুসারে এখন মাঝারি চাল কিনতে হচ্ছে আগের মোটা চালের দামে। পানজাব হরিয়ানার চাষীরা এই মাঝারি ধান বিক্রি করছে ৯৯ টাকা কুইনটাল দরে। ভারত সরকার যে স্পেসিফিকেশন করে দিয়েছেন তাতে এই মাঝারি চালে কাঁকর থাকতে পারে শতকরা ২ ভাগ, খারাপ চাল শতকরা ৫ ভাগ, সাদা চাল বারো ভাগ, বর্ণহীন চাল শতকরা ১০ ভাগ, ভাঙা চাল ২৫ ভাগ মোট ৬৪ ভাগই থাকতে পারে অখাদ্য চাল। এছাড়া সেদ্ধ করার জন্য মিল মালিকেরা কুইনটাল প্রতি ৫ টাকা করে নিলেও নামমাত্র সেদ্ধ করে তা এফ সি আইকে বিক্রি করা হচ্ছে। এর ফলে এই সব ধান এক বছরের বেশি রাখলেই পচে যাচ্ছে। এখন এফ সি আই-এর হাতে খাদ্য মজুত আছে ১৩০ লক্ষ টন গম ও ৯০ লক্ষ টন চাল। নতুন স্টক অন্তত তিন বছর গুদামে রেখে দিতে হয়। তিন বছর পরে যখন মাল বার করা হয় গুদাম থেকে তখন তা হয় পচা দুর্গন্ধযুক্ত। সেই চালই আমরা খাই—রেশনে। এফ সি আই-এর কল্যাণে ★

আলোকচিত্র : রাজীব বসু

হিকি ও ভারতীয় সংবাদপত্রের দু'শ বছর

সুগত মিত্র

ভারতবর্ষে প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশের গৌরব নিঃসন্দেহে হিকির। কিন্তু তার অনেকদিন আগে থেকেই ইংরেজ রাজপুরুষদের মনে সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা স্থান পেয়েছিল। ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের তিন বছর পর অর্থাৎ ১৭৬৮ সালের কলকাতার কাউনসিল হাউসের দরজায় ও শহরের প্রকাশ্য কয়েকটি স্থানে একটি অভিনব বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটি অবশ্যই হাতে লেখা। কারণ শুধু কলকাতায় নয়, গোটা বাংলাদেশের কোথাও মুদ্রণযন্ত্রের অস্তিত্ব ছিলনা। বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী ও কলকাতার মেয়র কোর্টের অবৈতনিক বিচারক উইলিয়ম বোল্টস—বাংলা তথা ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাসে এক স্মরণীয় পুরুষ। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল সারা কলকাতায় কোথাও কোন মুদ্রণযন্ত্র নেই। এর ফলে, প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রচণ্ড অসুবিধে দেখা দিয়েছে। যদি অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই কাজের দায়িত্ব নিতে রাজি থাকেন তাহলে বোল্টস তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রস্তুত। শুধু তাই-ই নয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ নথিপত্রও তার কাছে রয়েছে। দরকার হলে কোন উৎসাহী ব্যক্তিকে তা সানন্দে পড়তে দেওয়া যেতে পারে।

এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে বোল্টস কোন সাড়া পেয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে পরবর্তী এগারো বছরের মধ্যেও যে ঐ অভাব মেটানো যায়নি তার প্রমাণ পাচ্ছি আমরা Busteed এর লেখা থেকে। Busteed তার 'Echoes from Old Calcutta' গ্রন্থে লিখেছেন : 'Not till 1780 did the first city in Asia possess a medium which combined the object of conveying public intelligence in print, with that of promulgating the ordinary business or social wants of its European inhabitants.' সেই অভাব মেটাবার গুরুদায়িত্ব পালনের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন জেমস অগাসট হিকি। ১৭৮০র ২৯ জানুয়ারি শনিবার ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হল। হিকির সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করল বেঙ্গল গেজেট সংবাদ সাপ্তাহিক হিসেবে।

বোল্টসের সেই আন্তরিক আবেদন সত্ত্বেও যে সংবাদপত্রের প্রকাশনা এই এগার বছর পেছিয়ে গেল তার কারণ কিন্তু মুদ্রণযন্ত্রের অভাব নয়, তার কারণ ছিল সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাব। ভারতবর্ষে প্রথম ছাপাখানা এসেছিল ১৫৫৬ খৃস্টাব্দে, গোয়ায় প্রথম বই বেরিয়েছিল ১৫৭৮এ। দোত্রিনা ক্রিস্টা। পর্তুগীজ বইয়ের তামিল অনুবাদ। বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা বসালেন কলকাতার পুস্তক ব্যবসায়ী এনড্রুজ, হুগলিতে। প্রথম বই ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengal language।' কলকাতায় ১৭৭৯ সালে বসলো কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানা, চার্লস উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে। এরা কেউ কিন্তু সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ভাবেননি। অথচ ছাপাখানার মতো মস্ত বড় একটা অস্ত্র ছিল তাদের হাতের মুঠোয়। এদিক দিয়ে হিকিকে পথিকৃৎ এর সম্মান দিতেই হবে।

শুধু প্রথম সাংবাদিকই নয়, কলকাতায় প্রথম বেসরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও হিকির। ১৭৮০তে বেঙ্গল গেজেট প্রেস প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে, ব্যবসা সূত্রে হিকি নিজস্ব একটি ছাপাখানা বসিয়েছিলেন। সেখানে শুধু সস্তায় হ্যানডবিল ও বিজ্ঞাপন ছাপার কাজই চলত। একে অবশ্য পুরোপুরি ছাপাখানা বলা চলেনা। শুধু কাজ চালানোর জন্যে এক সেট অক্ষর মাত্র। তবু এই দিয়েই ব্যবসাপত্র ভালই জমিয়েছিলেন হিকি। সরকারী কাজকর্মও করছিলেন কিছু কিছু। এতে হিকির মন ভরল না। আরও বড় কিছু করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ব্যবসাসূত্রে সে টাকা জমিয়েছিলেন তার থেকেই কয়েকশো টাকা ইংলনডে পাঠিয়ে দিলেন তিনি পুরো একসেট ছাপার যন্ত্রপাতি আর কিছু ডাক্তারির সরঞ্জামের জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারি করা আর তার হয়ে উঠলনা। একটি পূর্ণাঙ্গ খবরের কাগজ বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। বন্ধুবান্ধবের কাছে এ বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ চেয়ে প্রস্তাব পাঠালেন। তারাও তাকে উৎসাহ দিলেন সাধ্যমত। এতসব ঘটনার সার্থক ফলশ্রুতি ভারতের প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক বেঙ্গল গেজেট।

এ সবই অবশ্য বহুকথিত কাহিনী। কিন্তু এছাড়া হিকি সম্পর্কে আর কি-ই বা বলার আছে? হিকির সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বলতে গেলে এটুকুই। সে যুগের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও রাজন্যবর্গের ভিড়ে হিকি এমন কিছু এক উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব নয় যার জন্যে পরবর্তী প্রজন্ম তেমন গুরুত্ব দিয়ে তাকে মনে রাখবে। শুধু তার পথিকৃতের গৌরবময় ভূমিকার জন্যে ইতিহাস তাকে বরাদ্দ করেছে একটি বড় অনুচ্ছেদ অথবা একটি বড় পৃষ্ঠা মাত্র। হিকি কবে কোথায় জন্মেছিলেন, কখন এদেশে এসেছিলেন বা কি যে তার পিতৃপুরুষের পরিচয় এসব সম্পর্কে ইতিহাস বিস্তৃত করে কোথাও কিছু লিখে রাখেনি। পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে ১৭৭৬ থেকে ১৭৮২ পর্যন্ত তার কাজকর্মের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্র। হিকি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক সূত্র হল H. E. Busteed—এর 'Echoes from Old Calcutta' আর তৎকালীন ইংরেজ অ্যাটর্নী (ইনি কলকাতা হাইকোর্টের আনডার শেরিফ হিসেবেও কাজ করেছিলেন) উইলিয়ম হিকির 'মেমোয়্যার'। এরা হিকি সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ দেননি ঠিকই, কিন্তু তার সম্পর্কে তাদের যে অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে হিকির দেশকাল, কার্যকলাপ ও স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। পরবর্তীকালে হিকি সম্পর্কে যা-কিছু লেখা হয়েছে মোটামুটি এই দুটি বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই।

হিকির পত্রিকার পুরো নাম ছিল, 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট' অর 'ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজার'। পরে নাম পালটে দাঁড়ায় 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার'। শেষমেশ 'দ্য অরিজিনাল ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার।' মুদ্রিত বিষয় বস্তুটুকুর আয়তন দৈর্ঘ্যে একফুট প্রস্থে আট ইনচি। মোট দুটি পৃষ্ঠায় চারপাতা খবর। একটি পাতায় তিনটে করে কলাম। হিকির কাগজ নামে খবরের কাগজ হলেও খবরের অংশ খুবই কম। দু-একটি নামমাত্র সংবাদ ছাড়া কবিতা, বিজ্ঞাপন, নোটিস আর চিঠিপত্রেই গোটা কাগজ ভর্তি। খবর আসত জাহাজে করে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আর করেসপনডেনটদের মাধ্যমে। অধিকাংশই ইউরোপ বিষয়ক নতুবা ইংরেজদের যুদ্ধবিজয়ের কাহিনী, অথবা সুদূর মফঃস্বলে বলনাচের চিত্রচঞ্চল বিবরণ। ১৭৮০র ২০ মে'র গেজেট থেকে আমরা জানতে পারি, দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শহরে কয়েকদিন ধরে যাবতীয় দোকানপাট ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে পুরোপুরিই অচল ছিল, আমাদের এখনকার বাংলা বনধের মতই। কারণ, ছিল দেশের মধ্যে নির্দিষ্ট মুদ্রামান নিয়ে কমপানি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরোধ। কয়েকদিন

বন্ধ থাকার পর অবশেষে অচলাবস্থার অবসান হয়। ব্যবসায়ীদের কাছে কোমপানি নতি স্বীকার করে।

আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে হিকির পত্রিকায় ছাপার ভুল না থাকলেও ছাপা ও কাগজ দুই-ই ছিল শ্রীহীন। আর যা ছিল তা-হল নিম্নস্তরের রুচিহীন বিদ্রূপ। তবুও তখনকার কিছু ইংরেজ হিকির এই কাগজকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন। তাদের প্রায় চিঠিতেই 'superiority of your paper,' 'success of your paper' বা your excellent paper' জাতীয় বিশেষণ জুড়ে দেওয়া হত। অবশ্য ভারতীয় সংবাদপত্রের সেই জন্মলগ্নে হিকির পাঠকবর্গের এতটা উচ্ছ্বাস মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

হিকির গেজেটের মাসটহেডের তলায় ঘোষণা থাকত, 'A weekly political and commercial paper, open to all parties, but influenced by none.' কিন্তু তা নামে মাত্র। কার্যক্ষেত্রে হিকি ঠিক এর বিপরীত ছিলেন। ঘোষণার আক্ষরিক বিরোধিতা করে বলা যায়, সব দলের কাছে না হোক, কলকাতার হেসটিংস-বিরোধী দলের কাছে গেজেটের দরজা বিশেষ করে খোলা ছিল। হেসটিংস-বিরোধী ভাবধারায় হিকি প্রচণ্ড পরিমাণেই প্রভাবিত ছিলেন। যদিও তার 'Proposals'এ হিকি আদর্শ সাংবাদিকের মতই বলেছিলেন যে, 'no anecdote personal or domestic that can possibly convey the smallest offence to any single individual, shall ever be inserted'. তবুও খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার কাগজ ব্যক্তিগত কেচ্ছা, গালিগালাজ, কুৎসা ও পারস্পরিক আক্রমণের আদর্শ মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল। এদিক দিয়ে হিকির কাগজকে পুরোপুরিই সমকালের দর্পণ বলা যেতে পারে। যাই হোক তার এই সমালোচনার হাত থেকে আপামর জনসাধারণ কেউই রেহাই পেলেন না। ওয়ারেন হেসটিংস থেকে কোমপানির সামান্যতম কর্মচারী, প্রত্যেককেই হিকির কলমের খোঁচা সহ্য করতে হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন বড়লাট হেসটিংস আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইমপে। বিভিন্ন ধরনের নাটক কবিতা আর চুটকি বের হত এদের' সম্বন্ধে। হালকা রঙ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করাই ছিল হিকির মূল উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে এসবের ভাষা যে শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে যেত তার কারণ হিকির অপরিশীলিত চিন্তাভাবনা।

কিন্তু সাংবাদিকের মূল বৈশিষ্ট্য যে নির্ভীক সমালোচনা তার থেকে হিকি জীবনেও বিচ্যুত হননি। আসলে দেশের মধ্যে যে হেসটিংস বিরোধী একটা বিরাট দল ছিল সে সম্পর্কে হিকি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর সরকারী কর্মচারীদের কেউ কেউ যে এই দলটিকে সমর্থন করতেন সেকথাও হিকি জানতেন। তাই সেই হেসটিংস-বিরোধী আবহাওয়াকে সম্বল করেই হিকি নির্ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পেয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন, হিকির এই সব কাজকর্মের পেছনে হেসটিংসের রাজনৈতিক শত্রু ফিলিপ ফ্রানসিসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কারণ, হিকির কাগজে ফ্রানসিসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমালোচনার দিক থেকে সম্পাদকের সুনজর লাভ করেছিলেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন, এসবের জন্য অবশ্য হিকিকে কম দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি। একাধিকবার মানহানির অভিযোগে তাকে কারাবাস ও অর্থদণ্ড দুই-ই ভোগ করতে হয়েছিল। প্রথম দিন থেকেই আদালতে তার নামে একটা না একটা মামলা লেগেই থাকত; এর প্রত্যেকটিই মানহানির মামলা। এতে হিকি বিন্দুমাত্রও দমতেন না, বরং আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই বিচারকদের যথেচ্ছ গালাগাল করতে শুরু করে দিতেন। এমন দিনও গেছে যখন হিকি জেলে বসেই হেসটিংস-বিরোধী সম্পাদকীয় লিখেছেন পাতার পর পাতা। এর ফলে হিকির পরে সরকারী কর্তাব্যক্তিদের রাগ ক্রমশই চরমে উঠছিল। হেসটিংস উত্যক্ত হয়ে সেকালের আর একটি পত্রিকা India Gazette কে বিনা মাশুলে চলাচলের সুযোগ করে দিলেন। এতে হিকি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। বেসামাল হয়ে উঠল তার কলম। কিন্তু এবারে হেসটিংস আর বেশি সহ্য করলেন না। হিকিকে তো জেলে দিলেনই, উপরন্তু যে মেশিনে গেজেট ছাপা হত সেটাকেও পুরোপুরি বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। গেজেট ছাপা বন্ধ হল এবং এই ভাবে ১৭৮২র মারচ মাসে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের অপমৃত্যু ঘটল। বলা যেতে পারে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সূত্রপাতও সেই প্রথম। এর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাকি কুড়ি বছর একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এরা কেউই সমসাময়িক গভর্নর জেনারেলদের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি, মিনটো এরা সকলেই সংবাদপত্রের সমালোচনার ব্যাপারে রীতিমতন স্পর্শকাতর ছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের সকলকেই অল্পবিস্তর দুর্ভোগ সইতে হয়েছিল। কিন্তু চরমতম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন বোধহয় হিকি একাই। ★

এখনো সোয়া টাকায় বিয়ে হয়

গোপালচন্দ্র দে

আজকের যুগেও সোয়া টাকায় বৌ মেলে। বৌ পছন্দ না হলে পুনরায় সোয়া টাকা দিলে সেই বৌ খারিজও হয়। অবশ্য এমন বিয়ে-বিয়ে ব্যাপারটায় যেমন আমেজ আছে, তেমনি রসেরও উপাদান আছে। আর আছে বলেই রসিক লোকের কাছে সোয়া টাকায় বৌ পাওয়ার ব্যাপারটা সৌভাগ্যই বলতে হবে।

অবশ্য এই বিয়ের ব্যাপারটা একশ্রেণী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা বলি বিয়ে। ওরা বলে কণ্ঠিবদল। কণ্ঠিবদল অর্থাৎ কাঠের মালা নিয়ে যাদের কারবার তারাই একমাত্র সোয়া টাকায় বৌ কেনার অধিকারী।

কণ্ঠিবদলে বিয়ের মাপাজোকা কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। সারা জীবনের বোঝাও ঘাড়ে বইতে হবে না। জীবনসঙ্গিনী যদিও, তবুও ওরা পথের সঙ্গিনী। যে কোন মুহূর্তে কণ্ঠি বদলের বৌটিকে কণ্ঠি ছিঁড়ে বিদেয় করা যেতে পারে।

নবদ্বীপের পোড়ামাতলার অতি কাছে একটি জায়গায় কণ্ঠিবদলের বয়স বহু বছর পার হয়ে গেছে। এখনো এখানে কণ্ঠিবদল করে প্রায় প্রতিদিনই বিয়ে হচ্ছে।

ওই জায়গাটা এক সমিতির অধীনে। সেখানে বিভিন্ন বয়সী বৈষ্ণবী পাত্রীরা একহাত লম্বা ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকেন। কেউ কালো, বয়স কারো কম, কারো বেশি। পাত্রী কানা বা খোঁড়া কিনা তা ঘোমটা না খুললে বোঝার উপায় নেই।

উপরের আবরণ দেখে পাত্র বৈষ্ণবদের যাকে পছন্দ হবে তাকে ১ টাকা ৪ আনা দিয়ে বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ঘোমটা খুলে হয়ত দেখবেন সোয়া টাকার বৌটি তার ঠাকুমার বয়সী। তখন উপায় কি?

উপায় আছে। আর আছে বলেই ব্যাপারটা রসমধুর।

যাকে আমরা বলি বিবাহ বিচ্ছেদ, খৃস্টানরা বলেন ডিভোর্স, মুসলমানরা বলেন তালাক, ওরা তাকেই বলেন গচ্ছা।

এবার শীতের মরশুমে এক সপ্তাহে সোয়া টাকায় বিয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৮। সুধা দাসী ৪৩তম বর্ষে ২৩ বার কণ্ঠিবদল করে স্বামী পালটে সুধাসুন্দরী সেজেছেন।

এ বছর তিনি নতুন করে ঘোমটা টেনে কণ্ঠি বদল করেছেন হরেন্দ্রনাথ বৈরাগীর সঙ্গে।

হরেন্দ্রবাবুও সুধাসুন্দরীকে সোয়া টাকায় বিয়ে করার আগে ৩৯টি বৌ পাল্টেছেন। ★



প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হোক

বিশেষ প্রতিনিধি

চলচ্চিত্রে কি চুম্বন চালু হওয়া উচিত? প্রশ্নটা শুনেই ভাবছেন : ওকথা আবার কেন? এ নিয়ে তো তর্ক-বিতর্ক অনেক হয়ে গেছে। মোটামুটি সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে। ভারতীয় ছবিতে চুম্বন ঠাঁই করেও নিয়েছে। আমরা বাঙালীরা ভারতে তৈরি সাধারণত দুই ভাষায় ছবি দেখি : বাংলা আর হিন্দি। বাংলা ছবিতে চুম্বন বা যৌনমিলনের দৃশ্য আসছে অনেকটা ঠারেঠোরে; কিন্তু হিন্দি ছবিতে তা বেশ খোলাখুলিই জায়গা করে নিয়েছে পশ্চিমী ঢঙে।

এগিয়ে চলাই মানুষের ধর্ম। অনেকে হয়ত বলবেন : এতে দোষের কী আছে? এটা তো এগিয়ে চলারই অঙ্গ! আর তাই শুধু রূপালী পর্দার অধরা দূরত্বেই নয়, থিয়েটারে মঞ্চের সান্নিধ্যেও আমরা চুম্বন এবং নরনারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য পেতে শুরু করেছি। পকেট থেকে অনেক পয়সা খসিয়ে ভিড় করছি সব পচা-কাঁঠালের-গন্ধে-ছুটে-আসা মাছির মতো।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা হয়ত বেশ। অর্থাৎ সহ্যের সীমায়। সস্তায় আদিম ইচ্ছা পূরণের এ ব্যবস্থা মন্দ কী! কিন্তু ব্যাপারটা যে এখানেই থামছে না। কতকগুলো রোগ বড় তাড়াতাড়ি সংক্রামিত হয়ে পড়ে। সমাজের গায়ে ঘা দগদগ করতে থাকে। চলচ্চিত্রের চুম্বন আর ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যও দ্রুত সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে পর্দা ছেড়ে বাস্তবে।

কিছুদিন আগের কথা। মধ্য কলকাতার এক অভিজাত হলে গিয়েছিলাম একটি হিন্দি ছবি দেখতে। নায়িকা ভারতবর্ষ নামক বিশাল দেশের ঠিক কোন এলাকার লোক তা বুঝতে পারলাম না। তবে আড়াই ঘণ্টার অসংখ্য দৃশ্যে তার গায়ে সুতোর বিশেষ বালাই ছিল না। সেই নায়িকার স্বপ্ন দৃশ্যে নায়ক তাকে নানা ভাবে আদর করল, শেষে চুম্বনও। পরিচালক মশাই হয়ত এখনো পুরোপুরি পশ্চিমী হয়ে উঠতে পারেননি; তাই স্বপ্ন-টপ্ন এনে একটু ঢাকা-চাপা দিয়ে আসলে সব আঢাকা করে দিলেন। কিন্তু দৃশ্যগুলো এমন ভাবে এলো যে উত্তেজনা জাগাবার পরিবর্তে কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে উঠলো।

গা ঘিনঘিন করছিলো আর একটা ব্যাপারেও। আমার ঠিক পাশের দুটি সিট জুড়ে বসেছিল একটি জোড়া। আগেকার দিনে এদের কাব্য করে বলা হত কপোত-কপোতী। তার মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য ছিল। আজকাল আর সে ভাবে ওদের নিয়ে কাব্য করা হয় না। ওরা 'জোড়া' নামেই বেশি পরিচিত।

আমার পাশের জোড়াটির বয়স মনে হল বিশের কোঠায়। প্রথম থেকেই ওদের বসার ধরনটা ছিল বেশ শ্লথ। মনে হচ্ছিল দুটি সিট না হয়ে একটা হলেই ভালো হতো। একটু পরে দেখা গেল : পর্দার দৃশ্যগুলি ওরা মোটামুটি পুনরভিনয় করে চলেছে। একেবারে আমার গায়ের উপর। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম—ছেলেটার হাত মেয়েটির শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পর্দায় চুম্বন দৃশ্যে হলের আলো আবছা হয়ে এলো। ওরাও যেন এবার আরো মরীয়া হয়ে উঠলো। প্রেমে নাকি চেতন-অচেতন ভেদ লোপ পায়। কিন্তু এ কী প্রেম! ওরা পরিবেশ-সম্পর্কে এত অসচেতন হলো কি করে? বেডরুম দৃশ্যের এত অসঙ্কোচ আচরণ ওরা সিনেমা হলের ভিড়ে কি করে করছে? মনে হল—এদের ঠিক চিনতে পারছি না। কারা এরা? এরাই কি নতুন যুগ?

চলচ্চিত্রে বা মঞ্চে চুম্বন চালু হলে দর্শকদের, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের নৈতিক অধঃপতন ঘটতে পারে—এ ভয় অনেকের মনেই ছিল। তাই তারা এর বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাদের যুক্তি যে কোন কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত টেকেনি। জয় হয়েছে বিপক্ষেরই। কিন্তু আজকাল সিনেমা হলে পাশের সিটে বসে যে-সব দৃশ্য দেখতে হয় তাতে কি আমাদের নৈতিক মান বিশেষ উন্নত হচ্ছে? কথাটি ভেবে দেখার। একের বিভ্রান্ত আচরণ অন্যকে প্রলোভিত করাই স্বাভাবিক। তা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে তো প্রেক্ষাগৃহগুলি শুধু জোড়াদের জন্যই একদিন ছেড়ে দিতে হবে।

সিনেমা কিংবা থিয়েটার হলে তবু একটু ঘেরাটোপ আছে—আছে আলো-আঁধারির আড়াল। কিন্তু ওদের এই প্রেম প্রেম খেলা, এই যা-খুশি-তাই-করা, এ যে ক্রমশ পার্কে-ময়দানে-লেকে-ভিকটোরিয়ায়-বোটানিকসে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে! তার মধ্যে আবার অনেক বৈচিত্র্য। কখনো শুধু এক জোড়া নয়, কয়েক জোড়া মিলে চালিয়ে যাচ্ছে ওদের নির্লজ্জ কাণ্ডকারখানা।

যেমন ধরা যাক বোটানিকসের সেই দৃশ্যটি। সময়—শীতের দুপুর। কুশীলব তিন তরুণ ও তিন তরুণী। চোখমুখ বলছে—ওরা



সবাই বাঙালী। আমাদের চেনা ঘরের ছেলেমেয়ে। কিন্তু পোশাক আর ভাবভঙ্গি দেখে হঠাৎ চিনে ওঠা কঠিন। ওরা পোশাকেও মড, আচরণেও। আশপাশের লোকজন আর পরিবেশের প্রতি ওদের থোড়াই কেয়ার। প্রথমে মাজা দুলিয়ে, অদ্ভুত ভঙ্গি করে ছেলেগুলি নাচছিল। কণ্ঠে সোচ্চার কোরাস : 'আমার নাম অ্যানটনি, কাজের কিছুই শিখিনি……লা লা লা।' শেষের দিকটায় কিশোরকুমারের ভাঙা সুর টানার হাস্যকর প্রয়াস।

হাসছিলও। সঙ্গের তিন রঙ্গিণী। যৌবন-দেখানো পোশাকের তরুণীরা তরুণদের উন্মাদ কাণ্ডে মাঝে মাঝেই হেসে লুটিয়ে পড়ছিল ঘাসের সবুজে। ওদের হাসি আরো বেশি করে উত্তেজনা জাগাচ্ছিল

তরুণদের রক্তে। ওদের শরীর আরো মত্ত ; কণ্ঠ আরো উত্তাল। সেই উন্মাদনা মেয়েদেরও টানছিল। প্রথমে একজন, পরে অন্য দু'জন—তিনটি মেয়েই ছেলেদের নাচে যোগ দিল। ঠিক যেন হিন্দি সিনেমার দৃশ্য!

দেখতে দেখতে ওদের ঘিরে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। তাতেও ওদের সংকোচের বিশেষ বালাই দেখা গেল না। স্টেজ রিহার্সালের পর্যায় ওরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে।

দর্শকদের কারো চোখে কৌতুক ; কারো চোখে কিছুটা বিরক্তি। তবে ওরা নাচ থামাতেই সকলে একে একে সরে পড়ল। কিন্তু আমাকে ওরা টানছিল। জানতে ইচ্ছে করছিল ওদের কথা।

কিন্তু ওরা আমাকে কিভাবে নেবে বুঝতে পারছিলাম না। উদ্দেশ্য খুলে বলতেই একটি ছেলে একেবারে উদাত্ত আহ্বান জানাল! আসুন আসুন, আসুন। আমাদের মতো হ্যাগার্ডদের নিয়ে লিখবেন? তা কোন কাগজে দাদা?

দেখলাম মেয়েদের চোখে কৌতুক ঝিকমিক করছে। কিন্তু সকলেই বেশ সপ্রতিভ। প্রশ্ন রাখলাম ওদের কাছে। সদ্য কলেজে ঢোকা ছাত্রছাত্রী। ওরা ফ্রি মিকসিং-এ বিশ্বাসী। ওরা থুথু ফেলতে চায় চিরাচরিত সমাজ-প্রথা, রাজনীতি আর ঘুণধরা মূল্যবোধের গায়ে।

একটি ছেলে স্পষ্টই বললে—'ও সব প্রেম-টেম বুঝি না দাদা। আমি বুঝি ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট।' কথাটা বলতে বলতেই ওর চোখ চলে যায় একটি মেয়ের দিকে। মুখে মুচকি হাসি। মেয়েটির চোখে-মুখেও ইঙ্গিতময় হাসি ফুটে ওঠে ; চোখে পড়া যায় বিশেষ এক ভাষা। স্পষ্টতই তা প্যাশনের।

একজন স্পষ্ট আক্রমণ করে বসল—ভবিষ্যতের কথা ভেবে কি হবে বলতে পারেন? এ সমাজে আমরা ভালো ভাবে বাঁচতে পারবো, বড় হতে পারবো, যে সময় যা দরকার ঠিক ঠিক পেয়ে যাবো—এ গ্যারান্টি কে দেবে? এটা চানসের যুগ। আমাদের ভবিষ্যৎ কি আমরাই জানি! কে জানে হয়ত কোনদিন রাতের অন্ধকারে আপনি আমার মুখোমুখী হলেন—হয়ত এই আমিই ছুরি উঁচিয়ে বলবো—ভালো চান তো যা আছে দিয়ে দিন। কত ছেলেই তো আজ এ লাইনই ধরেছে। আমার



কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগছে না। ভাবছেন হতাশা, নৈরাশ্যবাদ? তা আছে বৈকি। বলতে পারেন আমাদের জীবনের অর্থ কী? সোজা কথা মশাই—বাবা একটু আনন্দ করতে চেয়েছিলেন বলেই আমরা পৃথিবীতে এসেছি। তার বেশি কী মানে আছে আমাদের জীবনের?

একটানা কথাগুলো বলে ছেলেটা হাঁপাচ্ছিল। আমার চোখ-মুখ বেশ রাঙা হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু পাশে বসা মেয়েদের মুখে লজ্জার কোন রক্তিমা নেই। ওদের মুখে মজা পাওয়ার হাসি।

আগের ছেলেটির কথার রেশ টেনে আরেকটি ছেলে মুখ খুলল বলল—দেখুন, আমরা বুঝি কঠিন বাস্তব। ওসব ইমোশন-টিমোশনের ধার ধারিনা। আমাদের কাছে গোপনীয় বলে কিছু নেই। আমরা সব কিছুকেই আলোয় টেনে আনতে চাই। আমাদের আচরণ, বিশেষ করে সেকস সম্পর্কে আমাদের আচরণও তাই খোলাখুলি বাস্তব বয়সীরা এ সব ভালো চোখে দেখে না জানি। কিন্তু ও সব আমরা কেয়ার করি না। বলতে পারেন, কেয়ার করে কী লাভ?

না, এ প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিনি। শুধু মেয়েদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম—এই যে এভাবে আপনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাতে আপনাদের বাড়ির লোকেরা কিছু মনে করেন না?

এক জনের সরস উত্তর : আপনি যদি কাগজে আমাদের নাম-ঠিকানা ছাপিয়ে দেন তাহলে কী হবে বলতে পারি না। তা না হলে বাড়ির লোক টেরই পায় না। আমরা কলেজ পালিয়ে কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি তা বাড়ির লোক জানবেই বা কি করে?

আর একটি মেয়ে ঈষৎ লাজুক। বলল—দেখুন, সত্যি বলতে কি, একটু বুক দুরদুর করেই। যদি চেনাজানা কারো সামনে পড়ে যাই। তবে ওসব নিয়ে বেশি ভাবি না।

শুধু বর্তমান নিয়ে নয়, এখনকার তরুণ-তরুণীদের এক বিরাট অংশ হয়ত ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে না। ভাবে না বলেই যেখানে যেমন-খুশি আচরণ করতে ওদের বাধে না। একজন সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই জেনারেশনের এ পথগামিতার মোদ্দা কারণগুলি হল : (১) ওদের কাছে পুরোনো মূল্যবোধ কোন কাজে লাগছে না ; ওরা তাই সেগুলি প্রায় জোর করে ভেঙে দিতে চাইছে। (২) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনকার ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই দিশেহারা। তাই ওরা বর্তমানের কাছ থেকেই যতটুকু সম্ভব নিংড়ে নিতে চাইছে। তাতে ওরা তলিয়ে যাচ্ছে কিনা সে কথাও ওদের ভেবে দেখার মত প্রবণতা নেই। (৩) পাশ্চাত্যের উড়ন-চণ্ডী জীবনের দিকে এরা ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে। এ ব্যাপারে ওদের সাহায্য করছে বিদেশী পর্নোগ্রাফির বই, এ-মার্কা বিদেশী সিনেমা এবং বিশেষ করে হিন্দি ছায়াছবি। (৪) বর্তমান অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতায় তরুণ-তরুণীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। নেশাভাঙ আর বিকৃত যৌন আচরণের মাধ্যমে ওরা সেই অসহায়তাকে ঢেকে রাখার উদগ্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (৫) আর একটি বড় কারণ এদের অনেকেই আর আগের মত যৌথ পরিবারের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে মানুষ হচ্ছে না, বাবা-মার কাছ থেকেও আগের কালের মত পরিপূর্ণ স্নেহ-প্রীতি পাচ্ছে না।

তাই ওরা হাল-ছাড়া নৌকার মত ভেসে চলেছে যাদের ফাইভেল চমৎকার ভাষায় বলেছেন—They are boys and girls who appear adrift, without apparent direction in life, or recognizable moral standards, rejecting all authority, living only for the immediate gratification of desire and the search for security in the mob. (বিনয় ঘোষের মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ বই থেকে উদ্ধৃত)।

জীবনের প্রতি তরুণ সমাজের ছন্নছাড়া দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এক শ্রেণীর বাবা-মাও যথেষ্ট দায়ী। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গটি সুন্দর

ধরেছেন 'কলকাতার তরুণের মন' নিবন্ধে : "আমাদের সমাজে এই অকাল তরুণদের সমস্যা আরও একটি কারণে জটিল হয়েছে ও হচ্ছে। এই কারণটির গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন চেতনার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কারণটি হল—তিরিশ-চল্লিশ বছরের মা-বাবাদের সন্তানদের প্রতি আদরের একটা আদেখ্‌লেমি, গ্রাম্য বাংলায় যাকে বলে আদিখ্যেতা! এই সন্তান-আদিখ্যেতাকে আজকাল মা-বাবারা আধুনিকতা ও কালচারের নিদর্শন বলে মনে করেন।......এই সন্তান-আদরের আদেখলেমি আধুনিক ইংরেজোত্তর ভদ্রলোকদের একটা বিশিষ্ট 'কালচার-প্লেট'। তরুণ বয়সেও তাই ছেলেমেয়েরা 'খোকা-তরুণ' ও 'খুকু-তরুণী' হয়ে থাকে এবং তাদের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি সমান নয় ভেবে মা-বাবারা নিশ্চিন্ত থাকেন। অতঃপর হঠাৎ একদিন এই নিশ্চিন্ততা ভাঙে, যখন তারুণ্যের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এ-হেন উদার পরিবারের সামান্য বন্ধনটুকুও মানতে চায় না এবং যে-কোন প্রভুত্ব ও শাসন উপেক্ষা করতে চায়।"

এরাই দলে দলে গিয়ে ভিড় করছে ম্যারেজ রেজিসট্রারের অফিসে; আবার অবৈধ গর্ভপাতের জন্য যারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তাদের মধ্যেও এই শ্রেণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

তবে আজকের ছেলেমেয়েদের এক বিরাট অংশ হয়ত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে। বলবে—এমনটিই চলছে, এমনটিই চলবে। সমাজ, নিয়ম-নীতি এ সব আমরা মেনে চলবো কেন? এ সমাজ আমাদের কি দিয়েছে? অনেকে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেও লেখাপড়াই শেষ করতে পারছি না। পরীক্ষা দিই, অনেকের ফল বেরোয়ই না। বছরের পর বছর ঘুরে যায়। যারা কোন রকমে সার্টিফিকেট নামক কয়েকটা চোতা কাগজ জোগাড় করতে পারছি তারাও জানিনা ভবিষ্যতে কী হবে। তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও অনেকেই চাকরি-বাকরি কিছুই জোটাতে পারছে না। মেয়েদেরও বেশির ভাগই পঁচিশ-ছাব্বিশ কিংবা তারও বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে যাচ্ছে। কী করবে তারা? জৈবিক ধর্ম তো অতীতে যা ছিল এখনও তাই আছে। কিন্তু জীবনে অতীতের সেই নিশ্চয়তা কই? ছেলেমেয়েরা কি সব জড় পদার্থ? স্কুল-কলেজ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে চাকরি দিয়ে দিন; মেয়েদের সময় মত বিয়ে দিন, দেখবেন আমরাও তখন গুছিয়ে সংসার করবো, পার্কে পার্কে ঘুরে মরবো না।

ওদের কথাগুলি রেখেছিলাম চল্লিশোত্তীর্ণ এক ভদ্রলোকের কাছে। তার বক্তব্য : এ সব বাজে কথা। খলেরও যুক্তির অভাব হয় না। ওরা সময়মত চাকরি পাচ্ছে না বিয়ে করতে পারছে না বলে মাঠে-ময়দানে যা-খুশি করে বেড়াবে—মেয়েরা নার্সিং হোমে ছুটবে—এটা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে চুরি-ডাকাতিও স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই গ্রহণ করতে হয়।

জানতে ইচ্ছে করছিল যারা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় তারা একথা শুনে কী বলে। সন্ধ্যে নাগাদ চলে গেলাম লেকের ধারে। বেনচে ওরা দু'জন খুব কাছাকাছি বসে ছিল। আমি এক পাশে বসতেই ওরা দুটো শরীর অনেকটা আলাদা করে নিল। তবে ছেলেটির হাত মেয়েটির কাঁধেই রয়ে গেল। আমি ওদের দিকে একটু সরে বসে বললাম—'আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

ছেলেটির মুখে একটা ভয়ের ছায়া নেমে এসেই মিলিয়ে গেল। নকল দৃঢ়তা এনে বলল, কী ব্যাপারে?

—আপনাদের মত যারা আছেন তাদের নিয়ে আমি একটা আর্টিকেল লিখছি। তাই আপনাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

আমার কথায় ছেলেটির মুখে সন্দেহের রেখা দেখা দিল। কিন্তু মেয়েটি বলল, কী জানতে চান, বলুন।

আপনাদের চেনাজানা কত দিনের?

—মাস তিনেক হবে।

—কি করে পরিচয় হল?



—ও আর আমি একই পাড়াতে থাকি।

—এই যে আপনারা মেলামেশা করেন এতে বাড়ির লোক বা পাড়ার লোকেরা কিছু বলে না?

—বাড়ি থেকে এখনও কিছু কথা ওঠেনি। পাড়ায় কিছু কিছু আলোচনা হয়। ওতে আমরা কান দিই না।

—আপনারা কিভাবে বিয়ে করবেন? বাড়িতে বলে সবার মত নিয়ে? না, রেজেসট্রি করে?

এতক্ষণ আমার প্রশ্নের উত্তর মেয়েটিই দিচ্ছিল। এবারে ছেলেটি বলল, আমরা ও ব্যাপারে এখনো কিছু ভাবিনি। মেলামেশা করাটা এক জিনিস, বিয়ে ব্যাপারটা অনেক বড়। ওখানে দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

—তাহলে বিয়ের আগে মেলামেশা করায় কোন অপরাধ আছে বলে আপনারা মনে করেন না?

—অপরাধ? কিসের অপরাধ? আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে গেলে আপনাদেরগুলি আগে করতে হবে। আমাদের জন্য সমাজ-সংসার কী করেছে?

—ওকথা বলছেন কেন? সমাজ বা সংসার আপনাদের জন্য কি কিছুই করেনি?

—না। সরকার বা সমাজের কথা বাদ দিলাম। ওদের কাছে আমরা সমস্যা। এমনকি সংসারের কাছেও তাই। ছেলে বসে বসে খাচ্ছে। সংসারকে পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে না। তাই বাবা-মায়ের ভালবাসায়ও ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু মেয়েদের বেলায় তো একথা খাটে না? খুব কম সংসারই চায় মেয়ে চাকরি করুক।

এবারে মেয়েটি সরব হল—ও কথা বলবেন না। আমাদের বড় হওয়াটাই সংসারের কাছে অপরাধ। 'বিয়েতে যে অনেক খরচা!'

—যাক সে কথা। আপনারা এই যে পাবলিকলি মেলামেশা করেন, এটা বড়দের কাছে খুবই খারাপ লাগে। এ সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য কি?

ছেলেটি বলল, ওদের কথা বাদ দিন। ওরা আমাদের আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তখনকার সব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন। কিন্তু বিনিময়ে পরের জেনারেশনের জন্য যা করা উচিত ছিল তারা তা করেননি। যার ফল ভোগ করছি আমরা। অপরাধী ওরা। ওদের জ্ঞান দেওয়া সাজে না।

—কিন্তু যেহেতু আপনারা একটু অসুবিধায় পড়েছেন তাই প্রচলিত

প্রেমিকার সঙ্গে, ভিকটোরিয়ায়

বিশ্বজিৎ সিংহ

'এই যে দিদি, কিছু গিভ করো, আমি টেক করি'। শীর্ণকায়া একটি হাত। শতছিন্ন শাড়ি। এ্যাংলো ইনডিয়ান বুড়ি। নরম ঘাসের বুকে আমরা তখন বসে।

সম্পাদক মশাই, আপনি নির্ঘাৎ ভাবছেন গল্প ফেঁদেছি। বিশ্বাস করুন, তা নয়। পরে কী হলো ? সবুর করুন বলছি। আগে অন্যসব কথা সেরে নিই। কলকাতার পারকে পারকে জোড়ায় জোড়ায় যারা বসেন হঠাৎ তাদের নিয়ে পড়লেন কেন ? আপনার পরিকল্পনা অভিনব। তিন সপ্তাহ আগে প্রথম চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন ঃ 'যাও, তুমিও গিয়ে ঐ ভাবে বোসো। জানাও, কী দেখলে, বুঝলে।'

এখানেই যত বিপাক। আমাকে ঐ ফরমায়েস কেন বাপু ! আপনি তো প্রবীণ নন। তবু কেন জানেন না এই মহানগরীতে যত যুগলই থাকুন না কেন, সংখ্যায় সেই তরুণ-তরুণীরাই বেশি যারা বয়সকালেও ভালবাসার জন খুঁজে পাননি, পাচ্ছেন না ? সব কাগজের সম্পাদকদের দেখি একই চোখ। সমাজের সর্বক্ষেত্রে। 'হ্যান্ড'দের নিয়েই হৈ চৈ হয়, 'হ্যান্ড নট'রা কলমে ঠাঁই পায় না। যাহোক, আপনাকে চুপিচুপি বলি, আমার কোনো প্রেমিকা ছিল না। নাহলে আপনাকে বারবার তাগাদা দিতে হতো না।

খোলসা করেই জানাই। আপনি তো এক খাসা পরিকল্পনা দিয়েই খালাস। কিন্তু আমি কাকে নিয়ে বসি, প্রেমিকা পাই কোথায় ? ফোন করলাম, এক প্রাক্তন সহপাঠিনীকে। স্মারট, বুদ্ধিমতী এবং আধুনিকা—জানতাম। গোটা পরিকল্পনা শুনে জবাব দিল ঃ 'আমায় বিয়ে করবে ? কথা দাও, যেতে রাজি'। ঠক করে রিসিভার নামিয়ে রেখেই মনে হলো, ও ঠিকই বলেছে। এ দেশের মানুষ ডেটিং নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাস রাত জেগে পড়তে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। এ সময় এক দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোরটিং করতে গিয়ে ক্যামপাসে দেখি রীতা। বড়সড়ো হয়ে গিয়েছে, প্রায় লেডি। একুশ-বাইশ হবে। রীতাই



ডাকলো, কাছে এলো। ওর দিদি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সিনিয়ার ছিলেন। স্নেহ করতেন। সেই সুবাদে তার বাড়িতে কচিৎ গিয়েছি। রীতা তখন ইসকুলের ছাত্রী।

সেনট্রাল লাইব্রেরির নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ আপনার পরিকল্পনা মনে পড়লো। নিছক মজা করতেই ছ'বছরের ছোট ঐ তরুণীকে তা সবিস্তারে বলেও দিলাম। শুনে রীতা চুপ। মাথা ঈষৎ নীচু করে ভাবলো। মিনিটখানেক পরেই আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রী জানালো ঃ 'রাজী'। রাজি ? বাড়ি, বন্ধু অথবা ভালবাসার কেউ ? জবাবে তার একটি কথা ঃ 'কবে, কোথায় এবং কখন, বলুন'। ঠিক হ্যায়। কালই। বুধবার। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের মেন গেট। বেলা সাড়ে বারোটা।

প্রথাকে ভেঙ্গে ফেলবেন এটা তো ঠিক নয় ! যদি একে মেনে নিতে হয় তাহলে পেটের দায়ে চুরি-ডাকাতিকেও মেনে নেওয়া উচিত ?

ছেলেটি এবারে বেশ উত্তেজিত। ও বলল, অত তর্কের ধার ধারিনা। আমাদের কথা কেউ ভাবে না। তাই আমরাও কিছু ভাবব না। যা মন চায় তাই করব।

মনে হল ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়ে যেতে পারে। তাই ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। রাত ন'টা। কয়েক জোড়া তখনও বসে আছে। ওরা খুব কাছাকাছি। মানুষের একটা চাওয়াকে পূর্ণ করতে ওরা ব্যস্ত।

ওদের যুক্তি তুলে ধরতেই চল্লিশোত্তর ব্রজদা প্রায় ক্ষেপে উঠলেন। বললেন—দ্যাখো, বাজে কথা বলো না। জীবনে সব কিছুরই একটা নিয়ম থাকে। প্রেম আমাদের সময়ও ছিল ; কিন্তু এদের মত আমরা তাকে হাটে খুলে ধরিনি। সব কিছুর মধ্যে একটা ঢাকা-চাপা ছিল ; ছিল লজ্জা-শরম। ওদের তো সে সবের বালাই নেই। তুমি বলছো ওরা নাকি সব গুঁড়িয়ে দিতে চায়। তাতো চাইবেই। যাদের কিছু গড়ার ক্ষমতা থাকে না, তারাই ভাঙে। আজকাল ছেলেমেয়েদের হাবভাব দেখলে লজ্জা করে। ওরা কি মানুষ নামের উপযুক্ত ? ওরা মেরুদণ্ডহীন এক শ্রেণীর প্রাণী মাত্র। ওদের কাছে প্রেম-প্রীতির সুস্থ বন্ধনের কোন বালাই নেই। যা হোক করে একটু দৈহিক সুখ হলেই হল। এই করে ওরা তলিয়ে যাচ্ছে ; পুরো সমাজ-কাঠামোটাকেও ধীরে ধীরে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। যারা নিজের জন্মদাতাকে সম্মান করতে জানে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। দেখো, সে দিন বেশি দূরে নেই।

ওর কথাগুলো রাখলাম ভিকটোরিয়ার কাছে ঘুরে-বেড়ানো একটি জোড়ার কাছে। বললাম—প্রেম একটা পবিত্র জিনিস। তাছাড়া ওটা নেহাৎই দু'জনের ব্যাপার। এই যে আপনারা সকলের চোখের সামনে এভাবে বসে থাকেন কিংবা ঘনিষ্ঠ হন, এতে আপনাদের খারাপ লাগে না ?

ছেলেটির মুখে ব্যঙ্গ-মেশানো হাসি ফুটে উঠল। বলল—আপনি ধরতাই বুলি চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেম তাদের কাছেই গোপন ব্যাপার যাদের মনে রঙ আছে। কঠিন বাস্তব আমাদের রঙ মুছে দিয়েছে। এ ভাবে মেলামেশা করা ছাড়া আমাদের উপায় কি ? আর একটা কথা একটু স্পষ্টই বলছি। ছেলেমেয়ে পরস্পরের শরীরের সান্নিধ্য চায়। সোজা পথে সেটা না পেলে বাঁকা পথ ধরতেই হয়। বাধ্য হয়েই আমরা সকলের চোখের সামনেই মেলামেশা করি। এতে আপত্তি করার কী আছে ?

— তাহলে আপনার কাছে শারীরিক সান্নিধ্যের বেশি কিছু নেই ?

—না। ছেলেটির স্পষ্ট উত্তর।

প্রশ্ন রাখলাম মেয়েটির কাছেও।—এই যে আপনি এর পাশে বসে আছেন, তা কি শুধু শরীরের আকর্ষণে ?

বেশ সপ্রতিভ মেয়েটি। চটপট জবাব দিল—অনেকটা ঠিকই বলেছেন। তবে মনের টানও আছে। তাছাড়া দেখুন ও আমাকে কত

পরদিন আমিই পনেরো মিনিট লেট। দেখি রীতা দাঁড়িয়ে। পরনে হালকা ছাপা তাঁতের শাড়ি। হলদে পাড়। কপালে নিখুঁত গোল হলুদ টিপ। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগও একই রং-এর। মুখে সলজ্জ হাসি।

প্রিয় সম্পাদক, চব্বিশ ঘণ্টা কারাকে মানুষ এভাবে বদলে যায় কিসের পরশে ? খটকাও লাগে। প্রেমিকাকে সেজে আসতে হয় নাকি—সুন্দরীকেও ? এমনিতে আমি দ্রুত চলাফেরা করি। কিন্তু ওর পাশাপাশি হেঁটে যেতে পা যেন অবশ। কোথায় বসি ? ভেবেছিলাম, প্রশস্ত বাগানের বেনচিতে। সব দখল। কোথাও একাকী পুরুষ বসে, ঘুমিয়েও অনেকে।

বসলাম, গাছের পাতার ছায়ায় সবুজ ঘাসের বুকে। মুখোমুখি। রীতা চুপ। হাতে কচি ঘাসের ডগা। নখে ছিঁড়ছে। এসময় সেই বুড়ির উদয়। ওর চাওয়া যেন মমতা মাখানো দাবি। ব্যাগ খুলে রীতা দিল চকচকে আধুলি। বলিরেখাময় জীর্ণ মুখে বুড়ি দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বিশ্বপিতার রায় যেন আগাম শুনিয়ে দিল ঃ 'গড ব্লেস করবে, তোমরা সুখী হবে গো।' রীতার মুখ রাঙা। আমিও লজ্জায় আবেগে বলে ফেললাম—'এই, শোনো…।' নিটোল কালো চোখ তুলে রীতা চাইলো আমার দিকে। কিন্তু, কিন্তু…ওর চোখের কাজল কোণে মুক্তোর মতো জল কেন ! পুরুষরা বুঝি চিরকাল এতেই ডোবে।

কিছু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে জোড়া জোড়া। অনেকেই আসছেন। গাছের গুঁড়ির আড়ালই বেশি পছন্দ। বেশ একটা মিষ্টি আবেশ করা গন্ধ। রীতা সেনট মেখেছে ? উঁহু, না। শুধু পাউডার।' দু'বেলা আমিও পাউডার মাখি। কই গন্ধ ছড়ায় নাতো। নাকি দয়িতার শরীরে এক আলাদা ঘ্রাণ থাকে যা পুরুষকে টানে, কাছে আরো কাছে ?

এদিকে সামনে হাজির দুই কিশোর। হাতে বিরাট ঝোলা। প্যাটিস, কেক, মাংসের চপ ভর্তি। দাম ? তিনগুণ। পরে নয়, এখনই নিতে হবে। দন্তে লাগছিল ওদের জোর মেনে নিতে। কেন জানি তর্ক করার স্পৃহাই ছিল না। ঝামেলাও নয়। তাই একরকম 'লভ ট্যাকস' গুণে দিলাম।

আড়াআড়ি এক গাছের গুঁড়ির ফাঁকে এক জোড়া সুবেশ তরুণ-তরুণী। দুই শরীর তখন দেড়। ভ্রূক্ষেপ নেই। বিভোর। প্রাচীরের আড়াল থেকে হায়নার মতো গুটিগুটি তিরিশ কোঠার সেই মানুষ ছড়ি হাতে এল শিকারের সামনে। ধনুকের ছেঁড়া ছিলার মতো ঐ মানিক জোড় আবার দুই শরীর। কী কথা হল কে জানে। হায়না চোখ উবু হয়ে বসে তরুণটির কাছ থেকে নিল কাগজের নোট।

রীতা এসব খবর আরো জানে। বন্ধুদের কাছে শুনেছে, কলকাতার প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রিয় মিলনক্ষেত্র লেক, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গারডেন ও বোটানিক্যাল গারডেন। আর জায়গা কোথায় ? মহানগরী তাদের তেমন স্থান দেয়নি। এই মওকাতেও ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে কিছু সুযোগসন্ধানী আয়ের পথ বের করেছে।

আমরা উঠলাম। পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে হাঁটতে গল্প। আমিই বক্তা। আমার ছোট্ট ভাইঝি টিংকু আমাকে ঠিক কি করে চিনে ফেলে, দারুণ রক্ষণশীল পরিবার হওয়া সত্ত্বেও আমার মা খোলাখুলি মিশতে দেন কী বিশ্বাসে, এসব শুনে রীতা বললো ঃ আপনার কী রকম বৌ পছন্দ ?

ঘুরে দক্ষিণ প্রান্তে আসতেই তীব্র শিস। মুহূর্তে শাড়ির আঁচল দিয়ে রীতা তার শরীরের উন্মুক্ত অংশ ঢেকে নিল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি, জনা পাঁচেক কিশোর। এ বয়সেই বড়ো ক্ষুধার্ত তাদের চাউনি।

হেঁটে পুতুল পুতুল গড়নের রীতা ক্লান্ত। বসলাম রেস কোরসের দিকের বাগানে। কাছেই বসে চার যুবতী। নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টায় মত্ত। সেখানে এলেন তিন যুবক। হাতে কালো ব্যাগ। বোধহয় মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ। আলাপ করতে চায়। অপরপক্ষ নাচার। ছেলেদের কাণ্ড দেখে রীতার খুব হাসি। হাসলে তার গালে টোল পড়ে। ভারি সুন্দর দেখায়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। খুশিতে উপচে পড়ে রীতা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'উঁহু, মোটেই না। তবে কারো কারো চোখ সুন্দর হলে সে ওরকমই দেখে।'

প্রাচীর ঘেঁষা ঝোপের নীচে এক দম্পতি। বাড়িতে বোধহয় এরকম ভাবে নিজেদের পায় না। বিকালের পড়ন্ত রোদে বাগানে পরিবারের কচিকাঁচাদের নিয়েও ঘুরছেন বহু কর্তা-গিন্নি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঝোপের ফাঁকে বসা ঐ দম্পতিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে এক শিশু তার মার কাছে জানতে চায় ঃ ওরা কী করছে ? ★

কিছু দেয়। নানান জিনিস পেতে কোন মেয়ের না ভালো লাগে ?

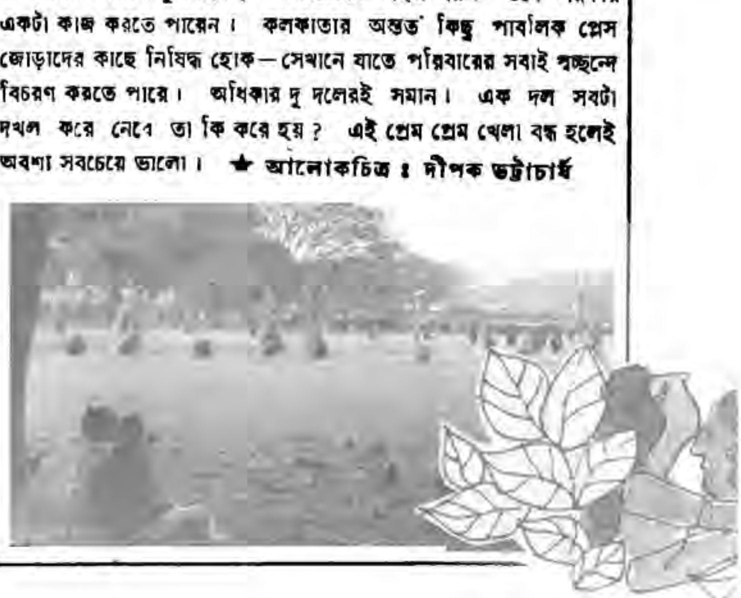
অর্থাৎ যুক্তি ওদেরও আছে। সেই সব যুক্তির আড়ালে ঝড়ের উটের মত বালিতে মুখ গুঁজে ওরা নিজেদের আচরণ সমর্থন করার চেষ্টা করে। অনেকে হয়ত তাও করে না। শুধু ক্ষণিক ইমোশনের স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। ওরা জানে না ভবিষ্যৎ কোন পথে ; মানে না সূক্ষ্ম কোন হৃদয়-বৃত্তির স্থায়ী সন্ধান। ফলে কলকাতার সব পাবলিক প্লেস যত দিন যাচ্ছে ততই জোড়ায় জোড়ায় ভরে যাচ্ছে।

শত অভাবের মধ্যে এতকাল বাঙালীর ঘরে একটা জিনিস ছিল। তা হল গভীর জীবনবোধ। এতকাল তাকে আঁকড়ে ধরেই আমরা জীবনের পথে চলেছি। বিদেশীরাও একে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। আজকের জেনারেশনের কাছে এগুলো হয়ত সস্তা সেনটিমেনটের কথা। হয়ত বলবে—যাদের জীবন নানা দিক থেকে অপূর্ণ তারা কোন কিছু দিয়ে নিজেদের ভরে তোলার চেষ্টা করবেই। সে অধিকার তাদের আছে।

কিন্তু এর আরেকটা দিক থেকে যাচ্ছে। পাড়ায় সংক্রামক ব্যাধি হলে তার ছোঁয়া সব বাড়িতেই এসে লাগতে পারে। তেমনি এদের এই উচ্ছৃংখল আচরণ ক্রমেই সংক্রামিত হয়ে উঠছে। এক জেনারেশন নষ্ট করছে পরের জেনারেশনকে।

কলকাতার বেশির ভাগ মানুষকেই বাস করতে হয় বন্ধ ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে। খোলামেলা জায়গায় গিয়ে একটু হাঁফ ছাড়ার জন্য ছিল পার্ক লেক ভিকটোরিয়ার চত্বর কিংবা ইডেন গারডেনস। কিন্তু যারা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় আর প্রেম প্রেম খেলা খেলে তাদের ভিড়ে ও সব জায়গায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে আজকাল ঢোকার কথা ভাবাই যায় না। নিজের ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাওয়ার রাস্তাটা দেখে নিক—এটা কেই বা চায় ?

অর্থাৎ সমস্যা দু' দিকেই। সমাধানও সহজ নয়। তবে সরকার একটা কাজ করতে পারেন। কলকাতার অন্তত কিছু পাবলিক প্লেস জোড়াদের কাছে নিষিদ্ধ হোক—সেখানে যাতে পরিবারের সবাই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে। অধিকার দু দলেরই সমান। এক দল সবটা দখল করে নেবে তা কি করে হয় ? এই প্রেম প্রেম খেলা বন্ধ হলেই অবশ্য সবচেয়ে ভালো। ★ আলোকচিত্র ঃ দীপক ভট্টাচার্য



মেষ : স্বাস্থ্যের ক্রমিক উন্নতি। ব্যয়ের চাপ হ্রাস পাবে। ধন সঞ্চয়ের ভাল রকম সুযোগ আসবে। কর্মস্থলে অবস্থা পুরোপুরি অনুকূল হতে আর কিছু দেরি হতে পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকা প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুকূল চলবে। মেয়েদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্তানদের সময় অত্যন্ত অশুভ। ব্যবসায়ীদের প্রাপ্য অর্থ আদায়ে ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার ধনবৃদ্ধি।

বৃষ : শরীর ভাল চলবে। পুরনো রোগের বহুলাংশে নিবৃত্তি। ব্যয়াধিক্য চললেও কিছু সঞ্চয় আশা করা যায়। কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতন কারও নজরে পড়বার সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ ; ভাল আয়বৃদ্ধির সুযোগ আসবে। মেয়েদের কর্মস্থলে সর্তকতা একান্ত প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ বিষয়ে তীব্র মনান্তর হতে পারে। মেয়েদের বন্ধুদের ওপর বিশেষ আস্থা রাখা ঠিক নয়। প্রতিযোগিতামূলক কাজে বাধা। ব্যবসায়ীদের সময় শুভ। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার স্বজন বিরোধ।

মিথুন : শরীর উদ্বেগের কারণ হবে। ছোটখাট রোগ উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। ব্যয় সংকোচন মুশকিল। কর্মস্থলে নতুন কোন ঝামেলা সৃষ্টি হবার আশংকা। আয়বৃদ্ধিতে বাধা। মেয়েদের কর্মস্থলে কারও সঙ্গে তীব্র মনান্তর হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্র অশুভ ; বিভিন্ন কাজে বাধা, অসাফল্য। সন্তানদের কর্মে সুনাম। স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহ দেরি। ব্যবসায়ীদের নতুন বিনিয়োগের পক্ষে সময় প্রতিকূল। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে অসাফল্য।

কর্কট : ছোটখাট অসুস্থতা লেগে থাকবে। ধনভাব অশুভ ব্যয়ের চাপ এড়ানো দুঃসাধ্য। কর্মস্থলে কারো প্ররোচনায় ঝঞ্ঝাট/ঝামেলায় পড়বার আশংকা। নানাভাবে আয় বাড়বার সুযোগ আসবে। মেয়েদের কর্মস্থলে প্রতি পদক্ষেপে সর্তকতা প্রয়োজন। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সহজ সমাধান। ভাই/বোনেদের সংগে মনোমালিন্যের আশংকা। ভৃত্য বা অধস্তন কারও দ্বারা সম্মানহানি হতে পারে। ধর্মকর্ম হবে। ব্যবসায়ীদের ঝামেলা চলবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার বন্ধু বিয়োগ।

সিংহ : শরীর দুশ্চিন্তার কারণ হবে

এই পক্ষ

ফেবরুয়ারি ১ থেকে ১৫

কফ ও পিত্ত সংক্রান্ত কোন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ধনভাব মোটামুটি অল্প স্বল্প সঞ্চয় হতে পারে। কর্মস্থলে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। মেয়েদের কর্মস্থলে ভুল বোঝাবুঝির অবসান। উল্লেখযোগ্য আয়বৃদ্ধি আশা করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ আত্মীয়স্বজনের সংগে সুস্থ সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জমি-জমা গৃহাদি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। প্রেম-প্রণয়ে বাধা। ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ শুভ হবে। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার লাভ।

কন্যা : শরীর অল্পস্বল্প অশান্তি আনবে। ধনভাব শুভ সঞ্চয়ের যোগ প্রবল। কর্মস্থলে নতুন যোগাযোগ শুভ হবে। মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট ঝামেলা চলবে। আয়ভাব আংশিক শুভ ; বিভিন্ন সূত্রে আয়বৃদ্ধি। মামলা মোকদ্দমা এড়িয়ে চলতে পারলে ভাল। শত্রুরা নতুনভাবে ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ হবে। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আঘাতপ্রাপ্তি।

তুলা : শরীর ভাল চলবে। ধনভাব শুভ আশানুরূপ সঞ্চয় হবার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চলবে। আয়বৃদ্ধিতে বাধা আয় বৃদ্ধির চেষ্টায় ব্যর্থতা, অসম্মান। মেয়েদের কর্মস্থলে নতুন সমস্যায় বিব্রত হতে হবে। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ সুখের হবে না। সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক কাজে অসাফল্য। ভৃত্যরা ক্ষতি করতে পারে। ব্যবসায়ীদের নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া ঠিক হবে না। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার কর্মে বাধা, ঝঞ্ঝাট।

বৃশ্চিক : পুরনো রোগের অনেক উপশম হবে। নানাভাবে সঞ্চয়ের সুযোগ আসবে। কর্মস্থলে ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, ও সম্মানহানি। আয়বৃদ্ধিতে বাধা। মেয়েদের কর্মস্থলে ছোটখাট অশান্তি চলবে। পারিবারিক ব্যাপারে অতিরিক্ত খোলাখুলি অশান্তির কারণ হবে। মেয়েদের বিবাহ ব্যাপারে অশান্তি। স্ত্রীর রক্তচাপজনিত পীড়ার বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের প্রায় সব ব্যাপারেই ভেবে চিন্তে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে দেরি।

শরীর মাঝে মাঝে উৎপাত করবে। ধনসঞ্চয়ে বাধা এলেও ক্ষীণ সঞ্চয় হতে পারে। কর্মস্থলে নতুন সুযোগ আসতে দেরি। আপাতত পুরনো সমস্যা বিব্রত করবে। মেয়েদের কর্মস্থলে স্থিতাবস্থা চলবে। নানাভাবে আয়বৃদ্ধির সুযোগ এলেও সেই অনুযায়ী আয়বৃদ্ধি আশা করা যায় না। পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীঘটিত কোন সমস্যায় বিব্রত হবার আশংকা। ভাই-বোনেদের সম্পর্কের অবনতি। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার গৃহ সুখে বাধা।

মকর : স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি। ব্যয়ের চাপ বেশ অসুবিধেয় ফেলতে পারে। কর্মস্থলে শত্রুরা সক্রিয় হবার চেষ্টা করলেও সুবিধে করতে পারবে না। আয়বৃদ্ধির চেষ্টায় সাফল্য। মেয়েদের কর্মস্থলে বেশ কিছুদিন ঝঞ্ঝাট চলবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। তথাকথিত হিতৈষীদের থেকে সাবধান। কোন প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগের সম্ভাবনা। স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষতির আশংকা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার সাফল্যে বিলম্ব।

কুম্ভ : শরীর খুব একটা ভাল চলবে না লিভার সংক্রান্ত রোগ উপেক্ষার নয়। ধনস্থান অশুভ ; আয়ের তুলনায় ব্যয়-যোগ প্রবল। কর্মস্থলে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত বিপাকে ফেলতে পারে। সামান্য আয়বৃদ্ধি আশা করা যায়। মেয়েদের কর্মস্থলে ধৈর্যচ্যুতি ক্ষতির কারণ হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক অসুস্থতাজনিত অশান্তি। স্বামী/স্ত্রীর আঘাত লাগার আশংকা। জমি-জমা, গৃহাদি ক্রয় বিক্রয়ে বাধা। ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই লগ্নের জাতক-জাতিকার মানসিক ক্লেশ।

মীন : হঠাৎ কোন অসুস্থতা শরীরকে বেশ কাবু করতে পারে। ব্যয়ের চাপ চললেও অল্পস্বল্প সঞ্চয় হবার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে নানাদিক থেকে বাধা আসতে পারে। আয় বৃদ্ধি সামান্যই। মেয়েদের কর্মস্থলে অশান্তি। পারিবারিক ক্ষেত্রে সন্তানদের স্বাস্থ্যহানি উদ্বেগের কারণ হবে। বিশেষ কোন রিপুর তাড়না বিপাকে ফেলবে। পায়ে কোন রকম আঘাত লাগার সম্ভাবনা। ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন ঝামেলা ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। এই লগ্নের জাতক–জাতিকার অসম্মান।

শ্রীভট্ট



আসন্ন সূর্যগ্রহণ কি ধ্বংস বয়ে আনবে?

অজয় বিশ্বাস

৩ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারি।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

স্পর্শ—দিবা ঘ. ২।৪৬।৩৬ গতে সূর্যবিম্বের নৈঋত কোণে স্পর্শ···এর পরে একসার অঙ্কের হিসেব করে পঞ্জিকায় স্থির করা আছে গ্রহণের মধ্য থেকে মোক্ষ, বিভিন্ন দেশে এর স্পর্শ এবং অন্তের সময়, স্থিতিকাল।

সূর্য/চন্দ্র যে গ্রহণই হোক না কেন জ্যোতিষের আলোকে তা সব সময়েই বিশেষ অর্থ বহন করে। সুদূরপ্রসারী ফলের কারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই কারকতা যে শুধু নৈসর্গিক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা নয়—সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমন কি জীবজগতের আধিব্যাধির উপরেও এর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে যে রাশিতে গ্রহণ হয়ে থাকে সেই রাশি অধিকৃত অংশ/অঞ্চলে কম বেশি দুর্যোগ/ঝঞ্ঝাট হয়ে থাকে। রাশির প্রকৃতি, তত্ত্ব, গ্রহণকালীন গ্রহাবস্থান এইসব ঘটনা/দুর্ঘটনার নিয়ন্তক হিসেবে কাজ করে।

এবারের এই সূর্যগ্রহণ বেশ কয়েকটি কারণে তাৎপর্যবহ। প্রথমত, এই গ্রহণ পূর্ণগ্রাস। ১৮৯৮-এর ২২ জানুয়ারির পর এই প্রথম পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হচ্ছে যা সারা ভারতে দৃশ্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর স্থিতিকাল : দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা যোল মিনিট ছ' সেকেন্ড। এতো দীর্ঘ সময় গ্রহণ এই শতকে আর কখনও হয়নি। তৃতীয়ত, এই গ্রহণ হচ্ছে মকর রাশি ক্ষেত্রে; জ্যোতিষশাস্ত্রকারদের মতে ভারতের রাশি (মতান্তরে লগ্ন) ক্ষেত্রে!

তাই এই তাৎপর্যপূর্ণ গ্রহণের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে জ্যোতিষীমহল ইতিমধ্যেই নানা গণনা গবেষণায় ব্যস্ত। তাদের এই গ্রহণ ভাবনার আভাস মিলল পশ্চিমবঙ্গ জ্যোতির্বিদ মহাসম্মেলনের সম্পাদক এবং লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব অ্যাসট্রোলজারসের অন্যতম ভারতীয় ফেলো পণ্ডিত মুরারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়। মুরারিবাবু জানালেন, 'আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই এক জ্যোতিষ আলোচনা-চক্রে মিলিত হয়েছিলাম। ১৯ আগস্ট '৭৯-এর এই আলোচনা-চক্রে বহু বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে তাদের গবেষণালব্ধ মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।'

কিন্তু এই গ্রহণ নিয়ে জ্যোতিষীদের এতো মাথাব্যথা কেন? এই গ্রহণ কি ভারতের জন্যে সত্যিই ধ্বংসের ইংগিত বয়ে আনছে?

আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, 'গত একশ' বছরে এতো দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার কখনো পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি। তাই এর প্রতিক্রিয়াও হবে সুদূর প্রসারী। শুধু ভারতই নয়, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, নেপাল, সৌদি আরব থেকেও এই গ্রহণ দেখা যাবে। তাই এই গ্রহণের অকল্যাণকর প্রভাব পড়বে এইসব দেশগুলিতেও।

চরম অর্থনৈতিক সংকট, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, রবিজাত শস্যহানি হবে; প্রকোপ বাড়বে সংক্রামক রোগের, ব্রেন টিউমার, লিউকোমিয়া, হার্টের অসুখ আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

ভারতের ক্ষেত্রে এইসব অশুভ ফলের কারকতা বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। কারণ ভারতের নিয়ন্তকগ্রহ শনি, মঙ্গলের সঙ্গে অশুভ প্রেক্ষায় আবদ্ধ হবে গ্রহণকালীন রবি। এর ফলে ১৯৮০-তে বন্যা, খরা, ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও ভারতকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটেরও মোকাবিলা করতে হবে। বৃহৎ শক্তির যুদ্ধ সম্ভাবনাও দেখা দেবে।'

'গ্রহণ নিয়ে জ্যোতিষীদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে পারমাণবিক বিজ্ঞানের যথেচ্ছ ব্যবহার। কারণ এর ফলে আবহমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তেজস্ক্রিয়তা বাড়ছে। ঋষি শাস্ত্রের সতর্কবাণী : ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম—আজ উপেক্ষিত। চিন্তাও সেই কারণে।'

> **গ্রহণে খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?**
>
> পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে লক্ষকোটি জীবাণু। এদের অনেকেই মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। সূর্য কিরণের অতিবেগুনীর মত জীবাণুধ্বংসী রশ্মি এদের নির্জীব/নিষ্ক্রিয় করে রাখে।
>
> কিন্তু গ্রহণের সময় সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছায় না। তার ফলে এইসব জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। রান্না করা (হাঁড়িপক্ক) খাবারে এইসব জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে; জীবাণুঘটিত রোগের কারণ হয়ে পড়ে খুব সহজেই। সেইজন্যে হিন্দুশাস্ত্রে গ্রহণকালীন খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ।

কিন্তু মুরারিবাবুর এই দুশ্চিন্তার প্রতিফলন দেখলাম না জ্যোতিষী ভৃগুজাতকের মন্তব্যে। অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে তিনি তার প্রতিক্রিয়া জানালেন, 'রবি এবং চন্দ্রের সঙ্গে ভূ-মণ্ডলের সম্পর্ক নিবিড়; তাই গ্রহণের ফল ভূ-মণ্ডলের ক্ষেত্রে দেখা গেলেও তা নিয়ে খুব চিন্তার কিছু দেখি না। শাস্ত্রে অবশ্য গ্রহণ দেখা না দেখা নিয়ে পাপ-পুণ্য বিধিনিষেধের ব্যাপার আছে; সে সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই।'

এই গ্রহণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী যে অশুভ প্রতিক্রিয়ার আশংকা করা হচ্ছে এর কি কোন বিজ্ঞানভিত্তি আছে? দীর্ঘস্থায়ী এই গ্রহণ নিয়ে কি ভাবছেন বিজ্ঞানীরা?

সাহা ইনসটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকসের তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ রাজকুমার মৈত্রের কাছে জ্যোতিষীদের আশংকার কথা তুলতে হেসে বললেন, 'জ্যোতিষী বলেছেন? সব বোগাস। ওদের শাস্ত্রটাই অবৈজ্ঞানিক। একদা অ্যাসট্রোনমির সঙ্গে যুক্ত অকাল্ট ব্যাপারগুলিকে নিয়ে ওদের কারবার। এখন একে বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেওয়ার একটা ট্রেন্ড এসেছে। মানুষ যত হতাশায় ভুগছে ততই এইসব তথাকথিত ভবিষ্যৎ-বক্তাদের কারবার ফুলে ফেঁপে উঠছে। গ্রহ-রত্ন তাবিজ কবচের ভার বাড়ছে, হাতের আঙুল থেকে গলা পর্যন্ত গলগ্রহের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের জন্যে লিউকোমিয়া বা ব্রেন টিউমারের মত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সামান্যতম সম্ভাবনাও তিনি নেহাতই অবিজ্ঞানোচিত বলে মনে করেন।

'সূর্যগ্রহণের আগে-পরে বিক্ষিপ্তভাবে দু' একটি এ ধরনের রোগ আক্রমণের নজির থেকে সিদ্ধান্ত নিলে বৈজ্ঞানিক সত্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের অনেক শর্ত আছে যার কোনটিই এইসব বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে মেনে চলা সম্ভব নয়।'

টেবিলের উপর রাখা বল পয়েন্ট পেনটি তুলে নিয়ে বললেন, 'এই পেনটির কথাই ধরুন, আমি এর ওজন নিলে যা হবে একই শর্ত সাপেক্ষে আপনি ওজন করলেও তাই-ই হবে। হয়ত এক-আধ দশমিক ভগ্নাংশের তফাৎ হবে। কারণ ওজনের পদ্ধতিটি বিজ্ঞান সম্মত।

কিন্তু আপনি যে কোন দিনের দশটি সংবাদ কিংবা সাময়িক পত্রে দশজন নামী জ্যোতিষীর করা 'রাশি ফল' মিলিয়ে দেখুন একই রাশির ক্ষেত্রে দশটিতে দশ রকম ফল। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য আসমান-জমিন। জ্যোতিষশাস্ত্র যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে এত অমিল কেন?' ★

বিশ্ব-বিচিত্রা

জীবাণু-মেঘ !

শুক্র গ্রহের মেঘে রয়েছে অসংখ্য সব জীবন্ত জীবাণু। এটি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান। স্যার ফ্রেড হয়েল ও শ্রী চন্দ্র উইক রামসিং এক প্রতিবেদনে বলেছেন ঃ মেঘগুলি হয়ত সালফিউরিক অ্যাসিডের তৈরি না-ও হতে পারে। গ্রহটির হলুদ রঙ এবং বায়ুমণ্ডলে জলকণার পরিমাণ দেখে ওরা তা অনুমান করেছেন। ওরা আরো বলেছেন ছায়াপথে ভিন্ন গ্রহাদির মেঘে ঐসব জীবাণুর অস্তিত্বই পৃথিবীর অনেক সংক্রামক ব্যাধির নাকি কারণ।

এল ডোরাডো

এল ডোরাডো। সোনার শহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছিলো স্পেনিয়ার্ডরা। পায়নি। এল ডোরাডো কি কাল্পনিক শহর ?

এই সেদিন ভেনিজুয়েলা-ব্রাজিলের সীমান্ত অঞ্চলে পর্যবেক্ষণরত ব্রাজিলিয়ান প্রত্নতত্ত্ববিদদের চোখে পড়লো গাছপালা লতাপাতায় ঢাকা একটি পিরামিড। এইভাবে খোঁজ পাওয়া গেলো ১৫০ মিটার উঁচু আরো দুটি পিরামিডের।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের একজন বলেছেন, 'এল ডোরাডো' যে সত্যি একদিন ছিলো এই পিরামিডগুলিই তার প্রমাণ।

পকেটে অনুবাদক

বহু ভাষা-ভাষী দেশ কানাডায় অনুবাদক যন্ত্রের সাহায্যে ইংরাজি থেকে ফরাসী, গ্রীক, ইটালিয়ান জাপানী ও স্পেনীয় ভাষায় সহজে অনুবাদ করা যাবে। এ উদ্দেশ্যে আমেরিকায় দুটি সংস্থা পৃথিবীর প্রথম পকেট সাইজ মিনি অনুবাদক-যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এর 'কী-বোরডে' ইংরাজি বর্ণমালা আছে। সেগুলোতে চাপ দিলে ইচ্ছে-মত শব্দ ও বাক্যাংশকে ঐ ৫টি ভাষার অনুবাদ করা যাবে। আলোর অক্ষরে ফুটে উঠবে শব্দগুলি ওর পর্দায়।

দ্বিগুন দাম

পিকিং-এ খাদ্য দ্রব্যের দাম ৫০ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া চীনের বাজারে বিক্রি হওয়া জিনিসের প্রায় এক পঞ্চমাংশের দামের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হচ্ছে। এটা সরকারী সিদ্ধান্ত। কাগজ, ফল, ধাতুদ্রব্য, প্লাসটিকের জিনিস ও বাঁশের তৈরি বেশির ভাগ শিল্পদ্রব্যের দামই বেড়েছে। চায়না নিউজ এজেনসীর খবর ঃ চাহিদা যোগানের নিয়ম মতই দাম নিয়ন্ত্রিত হবে। অবশ্য ডং ডান এবং কং ওয়েন—খাদ্য দ্রব্যের বাজারে এখন মাছি তাড়াচ্ছে দোকানীরা। খবর নভেমবর মাসের।

চা চাই না



ইংরেজরা আজকাল চা ছেড়ে মদের দিকে ঝুঁকছে। লনডনের কৃষি মন্ত্রকের খবর। মাথা পিছু চা ব্যবহার প্রায় ০·২২ কেজি থেকে ২·৯ কেজি কমেছে। মহাযুদ্ধের সময় থেকে কমতে কমতে এই পর্যায়ে। 'ফুড ফ্যাকটস' নামে বিভাগীয় মুখপত্রে খবরটি জানা গেছে। অথচ মাথা পিছু মদ্যপান গড়ে বছরে ১১৮ পাইট থেকে বেড়ে হয়েছে ১২১ পাইট। অর্থাৎ ২০% শতাংশ বেড়েছে বছরে। দুধের ব্যবহারও মাথাপিছু ১৯৭৫ এর তুলনায় কমে হয়েছে প্রায় ১৬ পাঁইট।

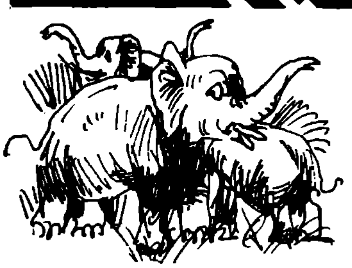
রাজ্যে রাজ্যে

একটি দাঁতাল হাতির জন্ম

পেরিয়ার অভয় অরণ্যে গাড়ি ঘোড়া ঢোকা একদম বারণ, লোকজনও চলাচল করতে পারবে না। এটা অবশ্য কোন সরকারি নির্দেশ নয়। কারণ কেরলের এই অভয় অরণ্যে পর্যটকরা আসুন এটাই চান কেরল সরকার। তবে বারণ করল কে ?

বারণ আর কে করবে ? সেখানকার হাতির পাল রাস্তা আটকে বসেছিল তিনদিন ধরে। সামনে অবশ্য সাইন বোর্ড টাঙানো হয়নি 'প্রবেশ নিষেধ' বা 'নো এনট্রি' বলে, তবু কেই বা আর শখ করে বুনো হাতির পালের মুখে প্রাণ দিতে যাবে !

পাহাড়ী এই অভয় অরণ্যে একদল হাতি হঠাৎ এসে এক জায়গায় জড় হলো। সঙ্গে একটি আট/দশ বছরের হাতি-কন্যা। তার প্রসব বেদনা উপস্থিত। ফলে ঘন ঘন ডাক ছাড়তে লাগল সেই হাতি-কন্যা। একে একে মা দিদিমারা এসে হাজির। ঘিরে ধরল তাকে সবাই। পুরুষ হাতিরা একটু দূরে দূরে পাহারায় দাঁড়িয়ে গেল চারদিক নজর রাখবার



জন্যে।

ফলে সে পথে গাড়িঘোড়া বা লোকজন চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। পেরিয়ারের ফরেসট অফিসারও সে পথে যাতায়াত বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। মজার ব্যাপার, হাতিরা শুধু লোকজনই নয় জঙ্গলের অন্য পশুদেরও ঘটনার ত্রিসীমানায় আসা বন্ধ করল।

সবুজ ঘাসের এই নরম জায়গাটা হাতি-কন্যা আর অন্য মা-দিদিমারা বোধ হয় ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল। ঘণ্টা পাঁচেক লেগেছিল প্রসব-কাজ শেষ করতে। হাতি-কন্যা ভালোয় ভালোয় একটি দাঁতালের জন্ম দিয়েছে।

ঘণ্টা পাঁচেক সময় যে লেগেছিল—একথা জানা গেল কি করে ? কেউ তো তার আশে-পাশেই যেতে পারেনি। সেটা সত্যি। আশে-পাশে যাওয়া তো দূরের কথা, দূরবীন দিয়েও সে জায়গায় আসলে কী হচ্ছে কিছুই বোঝা যায়নি। আসলে ফরেসট অফিসার অনুমান করছেন প্রসব ব্যাপারটা চুকতে ঐ ঘণ্টা পাঁচেকই লাগার কথা।

তবে হাতির পাল ঐ একই জায়গায় তিনদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে শুধু পুরুষ হাতিরা জল বা খাবারদাবার আনতে বাইরে গেছে আবার ফিরে এসেছে পাহারা দিতে। একজন ফিরলে তবে আরেকটি গেছে পালা করে।

বলা বাহুল্য ঐ তিনদিনই জায়গাটা বন্ধ ছিল। হস্তী-কন্যা দাঁতাল হাতি প্রসব করার পর মা ও নবজাত হাতিকে হাতির পাল তিন দিন ধরে পাহারা দিয়েছে।

তিনদিন পর পুরো দলটাই ক্রমশঃ সরতে সুরু করল। সে সময়ই ফরেসট অফিসার হাতি-কন্যা এবং তার দাঁতাল সন্তানটিকে এক নজরে দেখে নেন।

এই রকম একটা আনন্দের খবর পেয়ে কেরলের চিফ ওয়াইলড লাইফ ওয়ারডেন এন মাধবন পিল্লাই ছুটে এলেন পেরিয়ারে। হাতি-কন্যাকে দেখে তিনিই মত দিলেন সম্ভবত এইবারই তার প্রথম সন্তানটি জন্মাল। এবং মায়ের বয়স আট থেকে দশের মধ্যেই হবে। তার উচ্চতা ছ'ফুট।

হাতির পাল চলে যাবার সময় ফটোগ্রাফাররা ছবি তোলেন। ছবি উঠেছেও বেশ ভালো। মা রীতিমতো হাসিখুশি আর বাচ্চা দৌড়োদৌড়ি করে খেলাধুলোও করছে। তবে অন্য হাতিরা কোন বেওয়ারিশ লোক বা প্রাণীকে তখনও কাছাকাছি যেতে দেয়নি।

জেলায় জেলায়

রতুয়া থানার বাটনা ডাকঘরের অধীনস্থ কুমাড়িয়া গ্রামের একটি মেয়েকে ভুলিয়ে এনে শহর মালদহের নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মেয়েটি নাবালিকা। পরে ঐ গ্রামের একটি যুবক 'লছমী ঘরে' সিনেমা দেখতে যাবার সময় মেয়েটিকে দেখতে পায়। মেয়েটি ঐ যুবককে দেখে পালাবার চেষ্টা করলে বাড়িউলী রানী তাকে মারধোর করতে থাকে। ছেলেটি গ্রামে ফিরে এসে মেয়েটির বাবাকে খবর দেয়। মেয়ের বাবা ইংরাজ বাজার থানায় খবর দিলে থানা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবু থানা ঐ মেয়ে-বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোন ডায়েরী নিতে অস্বীকার করে। (গৌড়বার্তা/মালদহ)

সম্প্রতি এক্তেশ্বর মন্দিরে পূজারী জগন্নাথ দেঘুরিয়া বাবার পূজায় বিল্বপত্রের মধ্যে একটি সোনার শাঁখা পান। উক্ত অলংকারটি উপযুক্ত প্রমাণ লাভের পর মালিক শ্রীগঙ্গাধর সৎপাতির মাকে ফেরৎ দেওয়া হয়। শ্রী দেঘুরিয়ার এই সততায় এ অঞ্চলে অনেকেই মুগ্ধ। (হিন্দুবাণী/বাঁকুড়া)

অতিবৃষ্টির ফলে বুধপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চালা ভেঙ্গে যায়। কোন সরকারী সাহায্য সংস্কারের কাজের জন্য অনুমোদিত না হওয়ায় স্থানীয় স্কুল কমিটি নতুন চালা করে দেয় ৯০ টাকা চাঁদায়। কিছু লোক বিদ্বেষবশত সেই চালা রাতারাতি ভেঙ্গে দেয়। মিথ্যা অপপ্রচার করা হয় যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক। স্কুলটিতে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৯০ জন। (সাপ্তাহিক দিদিভাই/বীরভূম),

পাঁশকুড়া ধুলিয়াপুর এলাকায় এবং আশে-পাশের গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও গৃহস্থদের আলো দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। কেরোসিন তেল চোরাবাজারে তিন টাকাতেও পাওয়া না যাওয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই চালু বৈদ্যুতিক লাইন থেকে চোরাইভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত ঠাকুরচক গ্রামের ২০/২২ বছরের যুবক বিষ্টু হাজরার মেজছেলে কোন এক আর্থ কানেকশান বকস থেকে বিদ্যুৎ চুরি করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। (সরেজমিন/মেদিনীপুর)

দক্ষিণ পূর্বরেলের আদ্রা ডিভিশনে স্কিলড স্টাফেরা তাদের কাজের সময় প্রায় ৬০০ জন আনস্কিলড কর্মীদের মধ্যে ২০ জনের বেশি কাউকে কাজে পাচ্ছেন না। ঐ আনস্কিলড কর্মী বা খালাসীরা সকলেই প্রায় সুশিক্ষিত। তাই তাদের নিয়োগ যদিও খালাসী পদে, প্রশাসন তাদেরকে অফিসে কেরানীর কাজে নিযুক্ত রাখেন। এতে প্রশাসনের আপাত লাভ। কম বেতনে বেশি কাজ পাচ্ছেন। কিন্তু ভবিষ্যত ক্ষতিটা হচ্ছে; বর্তমানের উচ্চ-পদের স্কিলড কর্মীরা যখন অবসর নেবেন তখন ঐ শূন্য অবস্থাটা কিভাবে পূরণ হবে সেটা প্রশাসন ভেবে দেখেছেন কি ?

(শিখরভূমি/পুরুলিয়া)



দুবরাজপুর থানার বনমন্দড়া গ্রামের লাবু বাউরিনীকে দিনদুপুরে কে বা কারা গলার নলি কেটে তারই ঘরের ভিতরে ফাঁসী দেওয়ার মত ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। লাবু স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী। গ্রামের দুই অসৎচরিত্রের যুবক লাবুর উপর উৎপাৎ করত বলে প্রকাশ। বর্তমানে ওই দুজন পলাতক। পুলিশ প্রকৃত খুনীর সন্ধান পেয়েছে এবং গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

(চণ্ডীদাস/বীরভূম)

ছবি এঁকেছেন ঃ জি. সান্তা

ওপার বাংলা

প্রতারণা

চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিবেশক শাফ বিক্রমপুরীর কুড়ি হাজার টাকা চুরি করেছে অজ্ঞাত প্রতারক। প্রতারণার ধরন একটু অভিনব। চেকের পাতা চুরি করে জাল সই দিয়ে রূপালী ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকাটা তুলে নেওয়া হয়। ঘটনায় পরের দিন টাকা তুলতে গেলে এই ঘটনা ধরা পড়ে।

(চিত্রালী)

একা নয়

স্বামীর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়েছিল ১৮ বছরের আকালিকা বেগম। এক সময় সে নিজের শরীরে শাড়ি ও বস্তা জড়িয়ে আগুন জেলে নেয়। তারপর সব শেষ। ঘটনাটা ময়মনসিংহ শহরের।

(বাংলাদেশ টাইমস)

তছরূপ

গত বছরের ৩১ ডিসেমবর পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোতে মোট ৫৬২টি তহবিল তছরুপের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় মোট ৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা খোয়া গেছে। এর মধ্যে পরে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। (দৈনিক বাংলা)

নারকীয় !

না, নাতির রক্ত-মাংস-হাড় নিয়ে বিমলা রানীর নারকীয় ভোজ শেষ হল না। তার আগেই বাড়ির লোকজন ফিরে এলে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যান দিনাজপুর জেলার মানিকপুর থানার বিমলারানী।

পুলিশী সূত্রের খবর : বাড়ির লোকজন বেড়াতে গেলে নির্জনতার সুযোগে এক বছরের নাতি দিলীপকে ধারাল দা-এর আঘাতে হত্যা করে ৪৬ বছর বয়স্কা দিদিমা। তারপর শুরু হয় নাতির মাংসের নারকীয় ভোজ…

বিমলারানী এখন বিরোলের পুলিশ হাজতে। তার বিরুদ্ধে একটা মামলাও দায়ের করা হয়েছে। (বাংলাদেশ টাইমস)

কাঁচা ফিলম

চলতি বছরে বাংলাদেশ ফিলম ডেভেলপমেনট করপোরেশন কাঁচা ফিলম আমদানির জন্যে ৫০ লাখ টাকার বিদেশি মুদ্রা ব্যয়ের অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু এফ ডি সি-র জনৈক মুখপাত্রের মতে এই অর্থের সংস্থান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই অংক ১৫০ লাখ টাকা হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া বাংলাদেশের ফিলম-শিল্পকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

(বাংলাদেশ টাইমস)

গভীর ফাটল

সুন্দরবনের ২০ মাইল দক্ষিণে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় 'সোয়াজ অব নো ল্যানড' নামে গভীর ফাটলটি দেশের নদ-নদীর ওপর দিয়ে সাগরে নেমে যাওয়া অধিকাংশ পলি চুষে নিচ্ছে। ফলে উপকূলবর্তী সাগরবক্ষে কোন নতুন বড় দ্বীপ অথবা দ্বীপাঞ্চল গড়ে উঠতে পারছে না। (দৈনিক বাংলা)

তরল সোনা

এই শীতেই পেট্রো-বাংলা সীতাকুণ্ডে তেল অনুসন্ধানী ড্রিলিং কাজ শুরু করবে। তৈলবিশেষজ্ঞ ও ভূ-তাত্ত্বিকদের ধারণা প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের সম্ভাবনাময় ভাণ্ডার এখানে আছে।

পেট্রোলিয়াম ও খনিজসম্পদ দফতরের প্রতিমন্ত্রী সুনীল গুপ্ত সীতাকুণ্ডের নির্ধারিত স্থান পরিদর্শনে এসে এই তথ্য জানান।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

অভাবে

অভাবের তাড়নায় দেহোপজীবিনী হওয়ার জন্যে রংপুরের জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছেন এক সপ্তাহে ৪৬ জন। এদের মধ্যে অসহায় সন্তানের জননী আছেন, কুলবধূরাও আছেন। গ্রামাঞ্চলের তীব্র খাদ্য সংকট গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করেছে। প্রাণ ধারণের তাগিদে আদিম বৃত্তি বেছে নেওয়ার এই ঘটনা সেপটেমবরের শেষ সপ্তাহের। (দৈনিক ইত্তেফাক)

টাকার অভাবে

পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ না থাকায় উত্তরবঙ্গ কাগজ কলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গত ৩ মাসে এই কাগজ কলে নির্ধারিত লক্ষ্য ৩ হাজার টন কাগজের মধ্যে মাত্র ১ হাজার ১৭৫ টন কাগজ উৎপাদন হয়েছে।

১৯৭৩-৭৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার পর থেকে এই লোকসানের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা এবং দেনার পরিমাণ ৪ কোটি টাকা।

যান্ত্রিক ত্রুটি মুক্ত করে পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হলে ৮ কোটি টাকা প্রয়োজন বলে জেনারেল ম্যানেজার জানান।

(দৈনিক বাংলা)

চা-নীতি

১৯৭৯-৮০ আর্থিক বছরের জাতীয় চা-নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে ৭৫ কোটি টাকারও বেশি বিদেশী মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে বাণিজ্যমন্ত্রী সইফুর রহমান আশা প্রকাশ করেছেন। বর্তমান অর্থ বছরে চা-উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫.৫% মিলিয়ন পাউনড। (বাংলাদেশ অবজারভার)

কার কত সম্পত্তি ?

বাংলাদেশের কোথাও প্রেসিডেনট জিয়াউর রহমানের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। দেশের বাইরেরও তার কোন সম্পত্তি নেই। স্থাবর সম্পত্তি বলতে প্রেসিডেনট মাত্র আধ বিঘা জমির মালিক। এই জমিটি সাভারে।

সরকারীভাবে প্রকাশিত প্রেসিডেনটের সম্পত্তির বিবরণ থেকে এ তথ্য জানা যায়।

ভাইস-প্রেসিডেনট আবদুস সাত্তারেরও কোন বাড়ি নেই। তবে বনানীতে তার স্ত্রীর একটি বাড়ি রয়েছে। এই বাড়িটি তার স্ত্রীর নিজের টাকায় তৈরি।

স্থাবর সম্পত্তি বলতে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানের রয়েছে গুলশানে একটি অসম্পূর্ণ বাড়ি এবং কুষ্টিয়ার গ্রামে একটি ছনের ঘর। ১৫ এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ ছিল ৪১ হাজার ৯৩৯ টাকা ১৫ পয়সা এবং কারেনট অ্যাকাউনটে ২৫ হাজার ৬২৩ টাকা ১৫ পয়সা।

(দৈনিক বাংলা)

কিশোর অপরাধী

বাংলাদেশের কিশোর অপরাধীদের শতকরা ৭৫ জনই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। এদের মধ্যে ৪০ শতাংশই শিক্ষার সঙ্গে সংস্রব শূন্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গিয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, কুসঙ্গ, ও কর্ম বিমুখতাই এইসব কিশোরদের অপরাধ-প্রবণ করে তুলেছে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

লেডিজ অনলি

শুধুমাত্র মহিলা কর্মপ্রার্থীদের নাম তালিকা ভুক্তির জন্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং খুলনার তিনটি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্যে এ গুলি সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত হবে।

নাম তালিকাভুক্ত ছাড়াও চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে উপদেশ ও নির্দেশদানের কাজও করবে। (দৈনিক বাংলা)

দুর্নীতি বাড়ছে

বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন বিভাগ ১৯৭৬ জানুয়ারি থেকে '৭৬-র আগসট পর্যন্ত ৩৭৮৮ মামলা দায়ের করেছেন বিভিন্ন সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে। এইসব দুর্নীতির সঙ্গে ১৮.৭৯ কোটি টাকা জড়িত।

দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়ের করা মামলার সংখ্যা সম্প্রতি বেড়েই চলেছে। ১৯৭৭-এ মোট মামলা সংখ্যা ছিল ৯৬৫টি ; ১৯৭৮-এ তা বেড়ে হয় ১০৪৬ এবং '৭৯-র আগসট পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১১-তে।

১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত অনুসন্ধানের জন্যে বিএসি মোট ২৫ ৬৬৬টি ঘটনা নথিভুক্ত করে ; সেক্ষেত্রে ১৯৭৯ জানুয়ারি-আগসট পর্যন্ত নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা ২৫.৬৩৭।

(বাংলাদেশ অবজারভার)

বজ্র আটুনী

ভৈরব বাজার রেল সাইডিংয়ে বছর খানেক ধরে পড়ে আছে ৩২টি খোলা ওয়াগন। ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা বাহিনীর সজাগ প্রহরার সামনেই চুরি হয়ে গেছে বিয়ারিং, কী প্লেটস। ফলে বিকল ওয়াগন সচল হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

এই ওয়াগনগুলি কাজে না লাগানোর জন্যে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লাখ টাকা।

(দৈনিক বাংলা)

সরষের মধ্যে

পার্বতীপুর জংশন স্টেশন ইয়ারড থেকে মাল গাড়ির সিল ভেঙে ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ১৬০ মন চাল চুরি হয়েছে সম্প্রতি। নেপাল থেকে ৩৯ ওয়াগন চাল পৌঁছায় পার্বতীপুর ইয়ারডে। সেখানেই এই চুরি।

অভিযোগ এই কীর্তি রেলের নিরাপত্তা বাহিনীর সিপাইদের। বিভাগীয় তদন্তের পর ১ জন এস আই সহ ৭ সিপাই সাসপেনড !

(দৈনিক ইত্তেফাক)

উন্নয়ন প্রকল্প

৯০টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে কেবলমাত্র দিনাজপুর জেলায় ১ কোটি ৩৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন পর্ষদ।

মঞ্জুরীকৃত এই অর্থের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নখাতে ৯৫ লাখ টাকা, স্বাস্থ্যের-খাতে ১৮ লাখ, শিক্ষাখাতে ৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকা, কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্যে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।

(বাংলাদেশ টাইমস)

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প

গঙ্গা নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ভেড়ামারায় হার্ডিনজ ব্রীজের কাছে গঙ্গার পানি গত বছরের তুলনায় ১২ ফুট নীচে নেমে গিয়েছে। পানির প্রবাহ ১৬ লক্ষ কিউসেকের স্থানে এখন মাত্র ২ লক্ষ ১৫ হাজার কিউসেক। এইভাবে পানি প্রবাহ চললে জিকেপি পাম্প হাউস বন্ধ হয়ে যাবে। (দৈনিক ইত্তেফাক)

এক টাকার বাস

পয়লা অকটোবর থেকে ঢাকায় চালু হয়েছে এক টাকার বাস। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার এই বাস চলছে মীরপুর-গুলিস্তান রুটে।

এ বাসের ভাড়া এক টাকা। যেখান থেকে উঠুন কিংবা নামুন ভাড়া লাগবে একই।

(দৈনিক বাংলা)

বিদেশী গম

১৯৭৯-৮০ অর্থ বছরে কানাডা বাংলাদেশকে ৬ কোটি টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টন গম দেবে এবং এই গম পরিবহনের ভারও বহন করবে। সম্প্রতি দুই দেশের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(দৈনিক ইত্তেফাক)

বাংলাদেশের 'শিল্পকলা একাডেমী' ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে যে ১০ হাজার টাকার তোড়া উপহার দিয়েছিলেন, তিনি সেটি বাংলা দেশের সমাজ কল্যাণমূলক কাজে প্রদান করেন। —দৈনিক বাংলা





পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা পিছিয়ে রয়েছে কেন ?

শেখ জামান উল্লা



"There is no majority community in India in the absolute sense"—জবরদস্ত পার্লামেনটারিয়ান মধু লিমায়ের এই উক্তি মেনে নিলেও দেখা যাচ্ছে গত আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১.২১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি। আসাম (২৪.০৩%) পশ্চিমবঙ্গ (২০.৪৬%) কেরালা (১৯.৫০%) উত্তর প্রদেশ (১৫.৪৮%) বিহার (১৩.৪৮%) প্রভৃতি রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। জম্মু-কাশ্মীরে তো অ-মুসলমানরাই সংখ্যালঘু। ভারতের মুসলমানের যা সংখ্যা তা বিশ্বের বহু রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে যে কোন ভাবেই হেয় করে দেখা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। রাজনীতি, অর্থনীতি, স্থাপত্য, সাহিত্য সবেতেই মুসলমানরা তাদের স্বাক্ষর রেখে এসেছে। এদেশে বিদেশ থেকে বহু লোকই এসেছে 'কিন্তু যাকে সংস্কৃতির সম্পর্ক বলা যেতে পারে, তার প্রথম অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি ইসলাম থেকে এবং দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি ইংরেজ থেকে'—(আচার্য বিনোবা ভাবে।) ইংরেজরা আজ আর এখানে নেই, তাদের কথা থাক। কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তো আছে। উন্নত সেই সভ্যতার অধিকারী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও কার্যাবলী, এদেশের ঘটনাপ্রবাহে তাদের অংশীদারী, এই স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এতো অনুন্নত ও ক্ষীণ কেন ? অপ্রিয় সত্য, কিন্তু অস্বীকার করা অসম্ভব যে একই ঐতিহ্য ও চেতনার উত্তরসূরী হয়ে প্রায় একই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে প্রায় একই রকমের দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী করে প্রতিবেশী বাংলার মুসলমানরা এই বাংলার মুসলমানদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক চেতনা ও দেশ-গড়ার কাজে— সন্দেহ নেই—অনেকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু এই বাংলার মুসলমানরা সব-দিক দিয়ে পিছিয়ে কেন ? এর উত্তর একটি বা দুটি কারণেই সীমাবদ্ধ নয়, এক বা দু' বছরেই এই অনগ্রসরতা আরম্ভ হয়নি। এর উৎস সন্ধানে পিছিয়ে যেতে হবে দু'শো বছর।

পলাশীর যুদ্ধে সব খোওয়া যাওয়ার পর থেকেই এক'শ্রেণীর মুসলমান ইংরেজদের পিছনে ছায়ার মত লেগে থাকে। যারা সবকিছু ছিনিয়ে নিল সেই শত্রুদের শুভদৃষ্টিতে দেখা কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, মুসলমানদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তবে তখন তাদের অবস্থা হয়েছিল নির্বিষ সাপের মত। ক্লাইভের আঘাতে কোমর ভাঙলেও আহত সাপটি মাঝেমাঝেই উদ্যত হয়েছিল ছোবল দিতে। বিষের ভয়ে নয়, শুধু কামড়ের ভয়েই পলাশীর যুদ্ধের প্রায় একশো বছর পর পর্যন্ত ইংরেজরা দূর থেকে কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে মুসলমানদের মেনে চলেছে। ইংরেজ সিভিলিয়ান হানটার সাহেবের বক্তব্য এ বিষয়ে উল্লেখ করার মত : 'The Mussalmans of India are and have been for many years a source of chronic danger to the British Power in India'. ইংরেজের পক্ষে এ হেন মুসলমানদের ভালো চোখে দেখা সম্ভব হয়নি। উভয়েই সাত হাত দূরে থাকার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই অসহ-যোগের সুযোগ ইংরেজরা তাদের শাসনের স্বার্থে পূর্ণ রূপেই গ্রহণ করেছিল। তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রীতি নিয়ে অর্থ, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক কৌলিন্য লাভের স্বীকৃতি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই হিন্দুসমাজকে প্রতিষ্ঠালাভে সাহায্য করেছে ভেদনীতির বিষবৃক্ষ রোপণ করে। ভারতে তাদের সাম্রাজ্যের শিকড় সুপ্রোথিত করার উদ্দেশ্যেই এটা করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। রাজেন্দ্র প্রসাদ 'India Divided' গ্রন্থে লিখেছেন : 'It is a historical fact that in the earlier days of the British rule, the Muslims were more suspected than the Hindus and it is also undeniable, that for some years they were oppressed and suppressed more than the Hindus'. আরো পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এ আর দেশাই-এর Social Background of Indian Nationalism গ্রন্থে 'Many of their fine arts and crafts were ruined by the policy of the British Government, and thus many Mussalmans had been reduced to beggars.'

পলাশীর যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই যে পতনের অশুভ সূচনা হয়েছিল, সেই পতন ত্বরান্বিত হল পরপর কয়েকটি ব্যাপারে। সময়ের তালে পা ফেলে যারা চলতে পারে না, তারা পরিবর্তিত পটভূমিকায় মাথা তুলে বাঁচতে পারে না। মুসলমানরাও পলাশির যুদ্ধোত্তর পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে মৃত সিরাজের বেগমের মত সমাধির রক্ষণাবেক্ষণেই তাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল প্রচণ্ড দম্ভ ও প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে। নতুন দিনের আলোয় তাদের নতুন জীবনের অভিষেক হয়নি। অপরের কৌশল উপলব্ধি করার অক্ষমতা ও নিজেদের অনিচ্ছায় তারা পিছিয়ে পড়েছে।

Commerce and Knowledge—এই দুটি বস্তু পৃথক ; কিন্তু সম্পর্ক-শূন্য নয়। একটি না হলে অপরটির বিকাশ প্রায়





অসম্ভব। আর্থিক সচ্ছলতা ছাড়া বিদ্যার অঙ্গনে প্রবেশ ও সামাজিক সম্মানলাভ প্রায় অসম্ভব। নতুন পটভূমিকায় মুসলমানরা যখন জর্জর তখনই গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত এসে পড়ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লগুড়াঘাত। এ ঘটনা ওপর তলার মানুষদের বেশি আঘাত করলেও পরোক্ষভাবে ধনী-নির্ধন সকলেই হল এর শিকার। যে আর্থিক ওলটপালোট হয়ে গেল তা আর সামলানো সম্ভব হয়নি। মার্টিন সাহেব কথিত 'commerce and knowledge' দুটোই ঘা খেল প্রচণ্ড ভাবে।

এর পরেই এল নিষ্কর বাজেয়াপ্ত আইনের কশাঘাত। এ আইনের প্রধান শিকার দুটি। বিত্তশালী পরিবার ও মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ। এর আঘাত প্রধানত গিয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলের ওপর। কারণ শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ তখন গ্রামাঞ্চলেই ছিল বেশি। প্রচণ্ড ভয় ও আতঙ্ক দেখা দিল তৎকালীন মুসলমানদের মনে। ভবিষ্যৎ চিন্তাও কম বিচলিত করেনি তাদের। কিন্তু কিই বা করার ছিল? নিষ্কর বাজেয়াপ্ত আইনের বারুদ যে তুষের আগুনের সৃষ্টি করেছিল, তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে। এই বছরই ফার্সী ও আরবীকে বিতাড়িত করে রাজভাষা করা হল ইংরেজিকে। কলমের একটি খোঁচা-ই যথেষ্ট হয়েছিল মুসলমানদের বারোটা বাজাতে। অশুভ সংকেত বুঝতে পেরে কলকাতার প্রায় আট হাজার মুসলমান এক প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন বৃটিশ সিংহের কাছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে মেকলের প্রস্তাব যখন উইলিয়াম বেনটিংক সরকারী শিক্ষানীতি হিসাবে চালু করেন, চিৎপুরের গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে উদ্দীপ্ত। বয়স ১৮ বছর। এই ১৮ বছরে বেশ কিছু হিন্দু ছাত্র নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় সচেতন হয়ে হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়েছে। তারাই এই শিক্ষা নীতিতে উপকৃত হল। আরবী-ফার্সীকে ধরে থাকা মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় আদৌ মনযোগ দেয়নি। A B C জ্ঞানও তাদের নেই। ফলে তারা 'Not only became culturally backward but they also were excluded from the administrative posts, as well as legal, medical and other professions' (A.R Desai-এর পূর্বোক্ত পুস্তক)।

মুসলমানদের ওহাবী আন্দোলন প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে ইংরেজদের মনে বিরক্তি, ঘৃণা ও শত্রুতার সৃষ্টি করেছিল। 'তদানীন্তন মুসলমান সমাজে নানা দিক হইতে যে অধঃপতন আসিয়াছিল, হজরত মহম্মদের আদি শিক্ষার পুনঃপ্রবর্তনের দ্বারা ইসলামের পুনরুজ্জীবনই ছিল ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য'। ('সর্বোদয়ের পথ' গ্রন্থে আব্দুল ওদুদের প্রবন্ধ)। এই আন্দোলন ছিল ইংরেজদের কাছে একটি 'chronic danger', এই আন্দোলনের আগুন ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কখনো ধিকি ধিকি আবার কখনো তীব্র আকারে জ্বলেছে। উত্তর প্রদেশের স্যার সৈয়দ আহমদ এই আন্দোলনের প্রবর্তক হলেও বাংলার বহু মুসলমান ওহাবী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বাংলার মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন বিখ্যাত তিতুমিঁয়া বা তিতুমীর। আন্দোলনটি তীব্রতম আকার নেয় ১৮৫১ খৃস্টাব্দে। ওহাবী আন্দোলন নিছক উচ্ছ্বাস বা শত্রুতার প্রাবল্যেই সংগঠিত হয়নি এর পিছনে ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনা। ওহাবী আন্দোলন চলার মাঝেই ঘটে গেল সিপাহী বিদ্রোহ। যা স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু ওহাবী বা ফারাজী আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষাও অনেক সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার History of Freedom Movement-এর প্রথম খণ্ডে ওহাবী আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন: 'No doubt that the movement was much better planned and organised than the outbreak of 1857. It may be called the first War of Independence of India'

সিপাহী বিদ্রোহ, আমরা জানি ভারতবর্ষে একটা দারুণ আলোড়ন এনেছিল। মুসলমানরাও বাদ পড়েনি। কিন্তু প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল মুসলমানদের। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জীবনীতে গ্রাহাম সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পরবর্তী সময়টাই ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে দুঃসময়। (the darkest period in the history of Indian Mussalman) তারা এই সময় সবদিক থেকেই সব রকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য হয়েছিল। মুসলমানরা শুধু প্রাণী হিসাবেই টিঁকে রইল ও সংখ্যাবৃদ্ধি করতে লাগলো। কিন্তু দেশের একটি প্রধান সম্প্রদায় হিসাবে যা কিছু করার থাকে তা করা হল না। অপর দিকে যুগ সচেতন গতিশীল হিন্দুসমাজ সুযোগের সদ্ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় করে উন্নতি অব্যাহত রাখল। ইংরেজদের চাল অবশ্য কিছুটা সাফল্যলাভ করেও করল না। তারা বুঝতে পারল—দুধ-কলা দিয়ে পুষে রাখা সাপ এবার ছোবল মারবে। শিক্ষিত সচেতন হিন্দুসমাজ এবার সাগর পারের বিদেশীদের শত্রু হিসাবে বোঝার মত ক্ষমতা অর্জন করেছে, তাছাড়া সরকারী পরিচালনা ব্যবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ তারাই দখল করে নিয়েছে, এবার তারা অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করবে। চতুর ইংরেজ তাই এবার নতুন পথ ধরল। আবার সেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রীতি। পলাশীর যুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় হিন্দুদের তুলে ধরে দেবালয়ের প্রদীপ করা হয়েছিল, এবার তুলে ধরা হল মুসলমানদের। ১৮৭০-৭১ খৃস্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষার দিকে শাসকদের উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টি পড়ল। একটা ছোটখাট তদন্তও হয়ে গেল। তদন্তের রিপোর্টে জানা গেল চাকরির ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবই মুসলমান শূন্য। গোটা শিক্ষা বিভাগটাও হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। ফলে সৃষ্টি হল আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। যা কালক্রমে মুসলমানদের মধ্যে মূল্যবান চেতনা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্যই এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নবাব আবদুল লতিফের মহামেডান লিটারারি সোসাইটির কথা। কতকটা তারই ঐকান্তিক প্রয়াসে এর দশ বছর পরে হিন্দু কলেজ নাম পালটে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়। নবাব আব্দুল লতিফের কাজে সক্রিয় সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন সৈয়দ জালালুদ্দিন আফগানী, স্যর সৈয়দ আহমদ, মওলানা কেরামত আলি, জাসটিস সৈয়দ আমির আলি প্রমুখ। এদের প্রচারে মুসলিম সমাজের মোহভঙ্গ হয় এবং নতুনের প্রতি চেতনা জাগে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিন দশক পরেই ১৯০৬ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় মুসলিম লীগ, ঠিক যেমনটি হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের তিন দশক পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭—এই চার দশকের মধ্যে মুসলমানদের অবস্থা কতকটা থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড় গোছের। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণে মুসলমানদের ভূমিকা



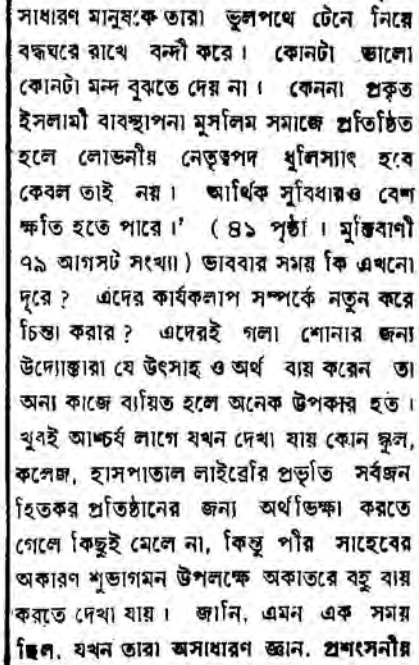
সর্বজনজ্ঞাত। তবে অবশ্যই ভুললে চলবে না—কংগ্রেস, না মুসলিম লীগ এই প্রশ্নের সমাধানেই তাদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছিল। ধর্মের দোহাই পর্যন্ত এসে যায়। যে ব্যক্তি মুসলিম লীগে নেই সে কাফের—এমন উক্তিও শোনা গিয়েছিল। আবার একথাও স্মরণযোগ্য যে গান্ধীজির রঘুপতি রামকে ঈশ্বর আল্লার সমপর্যায়ে স্তুতি করা (জওয়াহরলাল নেহরুও এর বিরোধীতা করেছিলেন) মুসলমানদের সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি সমন্বিত আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতকে প্রেরণাদায়ী মন্ত্ররূপে গ্রহণ প্রভৃতি মুসলমানদের প্রথমদিকে থমকে দাঁড় করিয়ে দিতে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল, পরে এল গতি। আর সেই গতিতে ছিটকে বেরিয়ে গেল দুটি টুকরো।

ভারত স্বাধীন হল। আমরা কৃতার্থ হলুম। খোঁড়া ল্যাং-ল্যাং ভারতবাসীরা খানিকটা চেঁচালেও শেষমেশ চুপ করে গেলাম। ১৪ আগস্ট বিতরণ করা হল 'দিলালি কা লাড্ডু'। প্রাজ্ঞজনেরা বললেন—কাজটা ভালো হল না কিন্তু কী আর করা যাবে! দু' টুকরো হওয়ার ফলে বহু মানুষের সমূহ সর্বনাশ তো হলই, কিন্তু সর্বাধিক ক্ষতি হল বোধহয় মুসলমানদেরই। দেশ বিভক্ত হওয়ামাত্র ধনমান জীবনের ভয়ে পশ্চিম বাংলা থেকে চলে গেলেন বহু মুসলমান পূবের পাকিস্তানে। কিন্তু জন্মভূমিকে ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নয়। তাই বৃহৎঅংশটাই পড়ে রইলেন কপাল চাপড়ে যে যেখানে ছিলেন। কিন্তু যারা গেলেন, তারাই ছিলেন 'মাথা', আর অবশিষ্টরা শুধুই অবশিষ্ট। প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী বা ট্যালেনটেড যারা ছিলেন তারা প্রায় সবাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। বহুকাঙ্ক্ষিত নতুন দেশে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হল নতুন উদ্যম, নতুন সৃষ্টির উল্লাস। তাই খণ্ডিত হওয়ার আঘাত সত্ত্বেও নতুন সংসার গোছানোর স্বপ্ন তাদের মধ্যে রইল পুরোমাত্রায়। ওপার বাংলা জেগে উঠল নব যৌবন জলতরঙ্গে।

এই বাঙলায় যারা কপাল চাপড়ে পড়ে রইলেন বা থাকতে বাধ্য হলেন, তাদের মধ্যেও যে কজন জ্ঞানীগুণী রাজনীতিক কবি সাহিত্যিক ছিলেন তারা সবাই আশাহতদের আলো দেখাতে লাগলেন, মাভৈঃ মন্ত্র দিলেন, কিন্তু সে আলো এতই ক্ষীণ ছিল যে তাতে হতাশার অন্ধকার দূর হলনা। সাধারণ মানুষের থেকে যারা একটু অসাধারণ ছিলেন, তারা হলেন 'মৌ—লোভী যত মৌলভী আর মোল্লারা'। এদের মুখনিঃসৃত বচনামৃত নির্বিচারেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সবাই জানেন এরা শুধু বেহেস্তের রাস্তাই দেখাতে পারেন (?) অন্য কিছু এদের কাছে আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই ইতিহাসের সেই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণেও ওরা ট্র্যাডিশন অনুযায়ী পরকাল সম্বন্ধেই বুলি আওড়াতে বেশি মনোযোগী হলেন। বিধ্বস্ত ভীত ও দিশেহারাদের সামনে ওরা কোনই আশার বাণীর অনুরণন তুলতে পারলেন না। এদের ব্যর্থ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে গভীর অনুতাপের সঙ্গে স্বাধীনতার তিরিশ বছর বাদেও লিখতে হয়ঃ এরা 'বেশির ভাগ...পরথেকো, বিলাসী নিচুমনা, স্বার্থপর বাস্তবজ্ঞান বুদ্ধি বিবর্জিত মুসলমান সমাজের ভাঙন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কতকগুলি ফৎওয়াবাজ। যাদের দ্বারা আজ পর্যন্ত সমাজ ও দেশের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। হবে এ আশাও করা যায় না।' (দামাল, ৩ মার্চ ৭৮) সুতরাং পথ প্রদর্শক রইলেন ঐ কজনই। দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই এই বঙ্গের মুসলমানরা হয়ে গেল দীন হীন।

স্বাধীনতার পরে তিন তিনটে দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন বাঙলার মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এদের অবস্থা কেমন? খাওয়া পরা বা বসবাসের কথা নয়—বলছি অন্য দিকগুলোর কথা। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, খেলাধুলা প্রভৃতির কথা। '১৯৭১ এর গণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৪,৪৩,১২,০১১। এর মধ্যে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৯০,৬৪,৩৩৪· অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২০·৪৫%। কিন্তু তাহলেও সরকারী কাজে এদের নিয়োগ ৪%-এরও কম।...সাধারণ ভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলীম সম্প্রদায় দারিদ্র্য-সীমার অনেক নিচে অবস্থান করছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও গোঁড়ামি জর্জরিত এই সম্প্রদায়টি পশ্চিমবঙ্গের সমাজ বিন্যাসের এক সান্ধ্য অঞ্চলই অধিকার করে আছেন...। (ইংরেজী সাপ্তাহিক 'লিঙ্ক' থেকে ৭ আগস্ট দৈনিক বসুমতীতে উদ্ধৃত) অর্থাৎ সোজা কথায় এদের অবস্থা বর্ণনায় 'শোচনীয়' 'মুমূর্ষু' 'সাংঘাতিক' 'ভয়ংকর' 'যাচ্ছেতাই' ইত্যাদ যা কিছু এই ধরনের বিশেষণ আছে সবই প্রযোয্য এরা কোন রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে টিকে আছে। হিন্দুদের তথাকথিত সবচেয়ে অন্ত্যজ শ্রেণী নমঃশূদ্রদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যখন পাঁচ শতাংশ, তখন মুসলমানদের মধ্যে এই হার চার শতাংশের একটুও বেশি নয়। এই একটি মাত্র পরিসংখ্যানই এদের অবস্থা বোঝাতে যথেষ্ট। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে চাকরি-বাকরি, শিল্প রাজনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতিতে মুসলমানদের স্থান কোথায় হতে পারে। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু সেই শিক্ষাতেই মুসলমানরা সবার পিছে সবার নীচে। একথা সত্য, মুসলমানরা কেন, অমুসলমানরাও তো তেমন কিছু উন্নতি করেনি। সামগ্রিক ভাবে শতকরা প্রায় ৭০ জনই তো নিরক্ষর। কিন্তু তবুও তারা

মুসলমানদের চেয়ে অনেকটা অগ্রবর্তী। কারণ তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেক—অনেক সচেতন ও শিক্ষানুরাগী। অপর দিকে মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি তেমন আকর্ষণ কোথায়? আর্থিক অসচ্ছলতা? না, এটা একটা কারণ হলেও মূল প্রতিবন্ধক নয়। এর অন্যতম একটা কারণ শিক্ষার প্রতি আকর্ষণহীনতা। অনেক মুসলমান পাওয়া যাবে যাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল; কিন্তু শিক্ষার প্রতি তাদের নিতান্ত অবহেলা। একটু বড় হলেই হয় পুত্রের শিক্ষাচ্ছেদ। স্থান হয় বুটি কিংবা দর্জির দোকানে। শিক্ষা সচেতনতা অনেকটা ত্বরান্বিত হবে যদি, 'ওয়াজকরনে' ওয়ালারা (ধর্মীয় জলসা) একটু কৃপাদৃষ্টি দেন। সারা বছর ধরে গ্রামে গঞ্জে মৌলভী বা আলেমরা বেশ কিছু টাকা পকেটে পুরে, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উদরসাৎ করে ওয়াজ করার নামে যে রকম গলাবাজি করে নিজেদের বিদ্যার দৌড় দেখান তা শ্রোতাদের কর্ণকুহর বিদীর্ণ করে সত্য, কিন্তু মর্ম্মে গিয়ে তা কতখানি আঘাত করে সন্দেহ আছে। এদের আসল ভূমিকা ও স্বরূপ কি? 'তারা আসলে দলবাজীর এক একটা চাঁই স্বরূপ। সাধারণ মানুষকে তারা ভুলপথে টেনে নিয়ে বদ্ধঘরে রাখে বন্দী করে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বুঝতে দেয় না। কেননা প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থাপনা মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে লোভনীয় নেতৃত্বপদ ধূলিস্যাৎ হবে কেবল তাই নয়। আর্থিক সুবিধারও বেশ ক্ষতি হতে পারে।' (৪১ পৃষ্ঠা। মুক্তিবাণী ৭৯ আগস্ট সংখ্যা) ভাববার সময় কি এখনো দূরে? এদের কার্যকলাপ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করার? এদেরই গলা শোনার জন্য উদ্যোক্তারা যে উৎসাহ ও অর্থ ব্যয় করেন তা অন্য কাজে ব্যয়িত হলে অনেক উপকার হত। খুবই আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় কোন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল লাইব্রেরি প্রভৃতি সর্বজন হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থভিক্ষা করতে গেলে কিছুই মেলে না, কিন্তু পীর সাহেবের অকারণ শুভাগমন উপলক্ষে অকাতরে বহু ব্যয় করতে দেখা যায়। জানি, এমন এক সময় ছিল, যখন তারা অসাধারণ জ্ঞান, প্রশংসনীয়



চারিত্রিক মাধুর্য, অবাক করা ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণাবলী নিয়ে মুসলমান সমাজের সামনে আলোকস্তম্ভের মত বিরাজ করতেন। জানি না, সেই আলোকস্তম্ভের দ্যুতি পূর্ববৎ সমান ভাস্বর কিনা! সেসব আলোকস্তম্ভ দেখে জাহাজ আর পথ চিনছে কিনা কে জানে! না, আমি তাদের আদৌ অসম্মান করছি না এবং করতেও বলছি না, শুধু বিনীত ভাবে বলতে চাই সেই পীরপূজারীদের: আপনারা একটু সময়ও অন্তত দিন, একটু অন্তত ব্যয় করুন, যাতে আপনারই 'ভাই'দের কিছু উন্নতি হয়।

প্রসঙ্গত নারী শিক্ষার কথা আপনিই এসে পড়ে। নারীই সংসারের সর্ব সময়ের অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী। তাদেরই উপর নির্ভর করে গৃহের পবিত্রতা, সংসারের শান্তি, সন্তানের শিক্ষা। সকলেই চান আদর্শ জননী, আদর্শ ভগিনী আদর্শ পত্নী, আদর্শ কন্যা। 'মিষ্টি ব্যবহার, মার্জিত রুচি, গৃহের আভিজাত্য অনেক ঝাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান নারীর মধ্যেই এ সবের একান্ত অভাব। কারণ—অশিক্ষা। যেখানে ছেলেরাই শিক্ষালাভে বঞ্চিত, সেখানে মেয়েরা শিক্ষালাভ করবে এই আশা দুরাশামাত্র। তাই সু-পাত্রের সুপাত্রী সহজ লভ্য নয়। যে পরিবারে শিক্ষার চর্চা আছে, সেখানে মেয়েদের স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও যেতে দেখা যায়। কিন্তু তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের যে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, তা অসহ্য। আনন্দের কথা, নিন্দাবাদ ও সমালোচনা সত্ত্বেও গত এক দশকে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক বেড়ে গেছে। আশা করা যায় অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে।

নারী শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার একটা প্রধান অন্তরায় হল পর্দাপ্রথা। মেয়েরা বড় হলে 'পর্দা' মেনে চলা ধর্মের দিক দিয়ে অবশ্য পালনীয়। সেই 'মৌ-লোভী যত মৌলভী আর মোল্লারা'…এ বিষয়ে নির্দয় কঠোরতা দেখান। পর্দা প্রথাকে কচু দেখিয়ে 'ওয়াজ' শুনতে সমবেত মহিলাদের সামনেই এরা যুগ যুগ ধরে চিৎকার করে আসছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা এরা দিচ্ছেন না। পর্দাপ্রথা মেনেও কিভাবে বাইরে চলা সম্ভব তা তারা কিছুতেই বুঝিয়ে বলবেন না। আর আমরাও বুঝতে চেষ্টা করব না। চোখ মেলে একবারও তাকাবো না বাইরের দুনিয়ার দিকে। একবারও উপলব্ধি করবো না অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর অগ্রগতি কতখানি।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে এখানে সব ধর্মাবলম্বীরা এবং সকল শ্রেণীর মানুষেরা সমান সুযোগ সুবিধা, অধিকার ও সম্মান পাবার



যোগ্য। 'Liberty of thought, expression, belief, faith and worship' ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম আশ্বাস। তাই মুসলমানদের দেখা যায় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিচারপতি, বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে। কিন্তু প্রথমত উল্লিখিত পদাধিকারীরা কেউ বাংলার লোক নন। দ্বিতীয়ত বলা যায় এরা সামগ্রিক অবস্থার ব্যতিক্রমের ফসল। ভারতের অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্যের নিচের সীমায় বাস করে তবুও দেশে গণ্ডাগণ্ডা কোটিপতি দেখা যায়। ঠিক তেমনি মুসলমানদের অনগ্রসরতা সত্ত্বেও বেশ কিছু ব্যক্তি উন্নতির চরমসীমায় উঠে গেছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও অবশিষ্ট সবাই দীনহীন। তাদের উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজন সরকারী প্রয়াস। মুসলমানদের মধ্যে নতুন মধ্যশ্রেণীর স্ফূরণ নেই। অতীতের অভিজাত সমাজে ক্ষয়িষ্ণু, দরিদ্র ও 'have not' শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অবস্থা দৃষ্টে ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়ো যেমন তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটা তদন্তের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। শুধু চাকরির ক্ষেত্রে 'কোটা' রাখা হোক এই দাবি করলে ভুল হবে। প্রয়োজন গোড়ার গলদ দূরীকরণ।

বাঙালী মানে শুধু হিন্দু নয়, বাঙলায় যারা বাস করেন তারা—'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান'…।…কিন্তু খুবই আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয়, এই বোধ সকলের নেই। ফলে মুসলমানেরাও যে বাঙলার অধিবাসী, তারাও যে বাঙলাকে জন্মভূমি বলে গণ্য করে থাকে, বাঙলার দুঃখে তাদেরও হৃদয় দুঃখিত, সুখে আনন্দিত হয়, চিত্ত উদ্বেল হয়ে থাকে, এমন চিন্তার উন্মেষ জোরালো নয়। এদেরও নিতে হবে সঙ্গে। 'Man-making is my mission'—বিবেকানন্দের এই বাণী ফুটে উঠুক সকল শ্রেণীর মানুষের কাজের মধ্যে। সকলের কাজে ও কথায় দেখা দিক সেই অমৃত বাণী 'উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতি কর্মসু'—ওঠো। জাগো। সকলের মহানব্রতে ব্রতী হও। 'সর্বে জনোঃ সুখিনো ভবন্তু'। তাহলেই 'সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা আঁধার হইবে আলা'। ★

আলোকচিত্র: দীপক ভট্টাচার্য

আমার স্বামী সৌমিত্র চ্যাটারজি



অপরূপ সুন্দর এক তরুণ কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের গেটের সামনে অপেক্ষায় থাকতেন। কিছুপরেই ভেতর থেকে লাজুক চাউনি মেলে এক মিষ্টি কিশোরী আসতেন বাইরে।

পঞ্চাশের দশকের ওই মানিকজোড়ই একালের চ্যাটারজি দম্পতি। সৌমিত্র আর দীপা। তরুণ জীবনের স্বপ্ন সার্থক করে তারা গড়েছেন সুখের সংসার।

সৌমিত্রকে কবে প্রথম দেখেন দীপা? দীপার বাবা এ্যাংলো ইনডিয়া জুট মিলসের পদস্থ অফিসার। সপরিবারে থাকতেন ব্যারাকপুর রিভার সাইড রোডের বাঙলোয়। দীপা ক্লাস নাইনের ছাত্রী। সৌমিত্রের বোন সহপাঠি। তখনই প্রথম দেখা। সৌমিত্র ছিলেন বছর চারেকের বড়। ডাক নাম 'পুলু'।

প্রথম দর্শনেই প্রেম? 'না। ওসব মাথায় আসেনি। পুলু দারুণ মিশুকে ছিল। বেশ হৈ চৈ করতো। আমি সবার সঙ্গে তেমন কথাই বলতে পারতাম না। ওর সঙ্গে গল্প করার চেয়ে ব্যাডমিনটন কোরটের দিকেই মন ছিল বেশি। তবু কেন জানি তখনও বুঝতাম, সৌমিত্রের আকর্ষণ দুর্বার'।

দীপার বাবা মা খেলাধুলার উৎসাহী ছিলেন। সৌমিত্রেরও এদিকে ঝোঁক ছিল। নিজেও হকি খেলতেন। খেলা নিয়ে নানা কথা হতো। সৌমিত্রই বলতেন, দীপা শ্রোতা।

এভাবেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর পরিণতি যে বিয়ে তা অবশ্য কেউ ভাবেননি। সৌমিত্র সিটি কলেজে পড়তেন। দীপা ভর্তি হলেন স্কটিশ চারচে; উঠলেন হোসটেলে।

কলকাতা এসে উভয়েই টান অনুভব করলেন। পারস্পরিক।' সৌমিত্র মাঝে মধ্যে এসে দাঁড়াতেন কলেজের গেটের সামনে। দীপার বান্ধবীরা কি করে জেনে গিয়েছিলেন। তারা খুব রাগাতেন, ঠাট্টা করতেন।

কোথায় যেতেন ওরা? দীপার মুখেই শুনুন: 'ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেতাম কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউসে। সবদিন পয়সা থাকত না। তাই পুলুর বাড়িতেও চলে যেতাম। ওর বাড়ির মানুষেরা খোলামেলা ছিলেন। বোধহয় সব বুঝতেনও'।

জন্মদিনে ওরা উপহার বিনিময় করতেন। প্রীতির নির্দশন দীপা নিজের কাছে রাখতে পারতেন না। বাড়ির লোকেরা যদি টের পায় এই ভয়ে।

বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন কি ভাবে? ষাট সালে ওরা দুজনেই অনুভব করলেন পরস্পরের কাছে ওরা অপরিহার্য হয়ে গিয়েছেন। সৌমিত্র তখন রেডিওর ঘোষক। মাস গেলে হাতে আসে বড়জোর শ দেড়েক। দীপার বাবার খুব আপত্তি। বললেন, 'জানি, সৌমিত্র ভালো ছেলে। কিন্তু দেড়শো টাকা আয়ে সংসার চলে না।' দীপার মনে হলো, রেডিওতে আরো ঘোষক আছেন, তাদেরও ওই রোজগার। তারা কি সংসার করেন না? এরপর দীপার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়নি।

সৌমিত্রের বাড়িতে আপত্তি ওঠেনি। গোল বাঁধলো অন্যত্র। মাথায় টোপর পরে বিয়ে করতে পুলু রাজি নয়। তার ইচ্ছে: রেজেসট্রি। পারিবারিক ধ্যান ধারণা ছিল: মন্ত্র পড়ে বিয়ে পবিত্র, বিশুদ্ধ। দীপা সেকথাই বোঝালেন। সৌমিত্র নারাজ হলেন না।

পুলু হয়েছেন দীপার স্বামী। সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে এসে গিয়েছে আরো খ্যাতি। চলচ্চিত্র জগৎকে কাঁপিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত নায়কের আসনে। এ সময় কি ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা দেয়নি? দীপার জবাব: 'এক সঙ্গে বাস করি বলে উভয়ের ব্যক্তিত্ব একাকার হবে কেন? আমরা কেউ নিজের মত অপরের উপর জোর করে চাপাই না। অন্যথা হলে হয়তো মনান্তর হতো। দুজনেই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম। তবে পারস্পরিক বিশ্বাস, সমঝোতা আন্তরিকতাই আমাদের সুখী দাম্পত্যের চাবিকাঠি'।

মতের অমিল কি একেবারেই হয় না? 'হয় বইকি। একসঙ্গে বসে কথা বলে মিটিয়ে নিই। পড়শিকেও কখনো ছুটে আসতে হয় না'।

সৌমিত্রের মনের ভেতরে আছে কিছু স্বপালিত আদর্শ। যেমন দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে রেখেছেন এক পাথরের টেবিল। তার দাদুর আমলের। এটিকে ডাইনিং টেবিল



করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই এর উপর প্লেটে খাবেন না। দীপা ভাবেন, 'পারিবারিক পুরোনো ধারা থেকে যাতে কখনো বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে সেজন্য পুলু নিজের মনেই অতি সতর্ক, হয়তও বা ভীতও।'

টি ভি, ফ্রিজ, এসব ঘরে রাখতে সৌমিত্রের প্রবল আপত্তি। এর প্রয়োজন বুঝতে চাইতেন না। তার বক্তব্য মা-দিদিমাদের আমলে এসব লাগত না। তারা তো আদর্শ সংসার করেছেন। ননদ ভাসুররা কেনার পর দীপা ফ্রিজ আনেন।

দীপা ঘরদোর ছবির মতো সাজিয়ে রাখতে ভালবাসেন। সৌমিত্র বলেন, এসবের দরকার কী? আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবেরা এসে অস্বস্তি বোধ করবেন। কেউ সহজভাবে মিশতে পারবে না। বাইরের দামী উপচার কেন? আন্তরিকতাই তো আসল। দীপা তার কথা শোনেননি। পরে সৌমিত্রও অবাক হয়ে দেখেছেন, তার বন্ধুরা আগের মতো ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। আর সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলায় দীপার কপট রাগও তারা উপভোগ করছেন। আগের পরিবেশ হারিয়ে যায়নি।

রাতে আড্ডা জমিয়ে গল্প করতে সৌমিত্র ভালবাসেন। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পার হবার পরই দিনের কাজকর্ম সেরে বন্ধু বান্ধবরা আসেন। ক্রিয়েটিভ আলোচনা হয়। দীপাও এতে যোগ দেন। এ পর্ব শেষ হলে সৌমিত্র আসন্ন অভিনয়ের স্ক্রিপট নিয়ে বসেন।

সৌমিত্র দীপার সংসার ভরিয়ে রেখেছে তাদের সন্তানরা। ছেলে সৌগত বড়, ডাক নাম বুবু। মেয়ে মিতিল, পোশাকী নাম পৌলমী। নামটাম দিয়েছেন দীপা নিজেই।

মিতিল নাচে ক্ল্যাসিক্যাল। সে ইতিমধ্যেই নাম কিনেছে। বুবু বাজাতো বেহালা। ছেলেমেয়েকে কি করতে চান তাদের বাবা মা? নিজেরা যা হতে চায় তাতে বাধা দিতে দীপা চান না। একমাত্র ছেলেও যদি কেরানীগিরি পছন্দ করে, করুক। তবে তার ধারণা, 'লেখাপড়ার ব্যাপারে সব বাবা মার গাইডেনস দেওয়া উচিত'। সৌমিত্র মুখ ফুটে কোনদিন কিছু বলেননি। জীবনে একবারও বকাঝকা করেননি। জোর নয়, বুঝিয়ে বলাতেই তিনি বিশ্বাসী। সৎ এবং সভ্য মানুষ হওয়াই তার কাছে বড়ো কথা।

চ্যাটারজি বাড়িতে বই ভর্তি। দীপা পছন্দ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। সতীনাথ ভাদুড়ীও বেশ লাগে। আর শক্তি চ্যাটারজির কবিতা। সৌমিত্র সব পড়েন। সিরিয়াস পাঠক। নৃতত্ত্ব, সঙ্গীত, শিল্পের বইতেও চোখ বোলান'। উরদুও পড়েন। ভালো লাগলে কবিতা পাঠ করেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই উপন্যাস কম পড়েন। মেয়ে মিতিল কিশোরী হয়েই সুনীল গাঙ্গুলির দারুণ ভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিন সৌমিত্র মেয়েকে বললেন, 'সুনীলকে চিনি রে, আমার বন্ধু'। মিতিলের বিশ্বাসই হয় না—'ইস, চেনো না আরো কিছু।'

নিজের পেশার কাজ ছাড়াও সৌমিত্র অভিনেতৃ সংঘের জন্য গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন। বাড়িতে থাকার সময় এতে কমেছে। অসহায় বয়োবৃদ্ধ শিল্পীদের জন্য স্বামীর দরদে দীপার গর্বই হয়েছে। এখন সৌমিত্র মঞ্চেও অভিনয় করছেন। দীপা বোঝেন, তার কর্তা যেখানেই সেখানে কিছু পরীক্ষা আছে, আদর্শ আছে।

সৌমিত্র সন্ধ্যার পর শুটিং করেন না। ফিলমস্টার বলে তাই তাকে কাছে পেতে পরিবারের মানুষদের অসুবিধা হয় না। দীপার কথায়, 'ও নিজে প্ল্যান করে সময় বের করে নেয়। চাকরি করা কর্তার মতই তাকে মেলে। এটা ওরই বুদ্ধিমত্তা'।

তবু দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয়। মধুর



ঝগড়া। বাড়িতে থাকলেও সৌমিত্র বই নিয়ে বসেন। দীপা গিয়ে বলেন, 'এই, চোখ তোলো। সংসারের কথাও তো আছে। সেটা কে শুনবে'?

বিয়ের পরই দীপা রান্না শিখেছেন শাশুড়ির কাছে। সৌমিত্রের পরিবারের ওরা মানেন। তাই বড়ি আচারও তৈরি করেন। কিচেনের দায়িত্ব পুরোপুরি দীপারই। তিনি সৌমিত্রকে বাইরে খেতে দিতে চান না। কোথাও গেলেই টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে দেন। ফ্লাসকে থাকে চা বা কফি।

সৌমিত্রের পাবলিক রিলেশনস অফিসার দীপাই। ফোন ধরতে হয়, চিঠি দেখতে হয়। 'ফ্যানের চিঠি আসে অসংখ্য। কোত্থেকে ঠিকানা পায় কে জানে। পুলু নিজে সব পড়ে। ফেলে দেয় না। উত্তরও লেখে। সময় কম বলে সবাইকে জবাব দিতে পারে না।'

ওরা দুজনেই গান বাজনা শোনেন। পাশ্চাত্য সংগীতও পছন্দ। ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্র সংগীতে গলাও মেলান।

খেলা দীপার জীবনে এক স্বপ্ন পূরণ করেছে। এজন্য স্বামীর কাছেও মনে মনে কৃতজ্ঞ। বিয়ের আগে বাইরে ব্যাডমিনটন খেলার সুযোগ মেলেনি। একদিন সৌমিত্রের বন্ধু ফুটবলার প্রদীপ ব্যানারজি গল্প করছিলেন। প্রখ্যাত ব্যাডমিনটন খেলোয়াড় দীপু ঘোষও বসে। 'আমি খেলতাম শুনে দীপু বললেন, চলুন বৌদি এক রাউনড হোক। একদিকে সৌমিত্র আর প্রদীপ। বিপক্ষে আমি আর দীপু। ছেলে তখন পাঁচ মাসের। সেই শুরু। কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপস। প্রথমবারেই দীপা রানার্স।

এরপর ব্যাডমিনটনে দীপার নেশা ধরে যায়। কাজকর্ম সেরে লিলুয়ায় প্র্যাকটিস করতে যেতেন। পরিবারের অনেকেরই সায় ছিল না। সৌমিত্রই উৎসাহ দিয়েছেন। সময় পেলে নিজে পৌঁছে দিয়ে আসতেন। রাজ্য ব্যাডমিনটনে দীর্ঘকালের সম্রাজ্ঞী দীপা এখন ভাবেন, ব্যাডমিনটন তাকে অন্য জগৎ দেখিয়েছে। কিন্তু স্বামী পাশে না থাকলে এর স্পর্শ তিনি পেতেন না।

দীপার পুজোর ঘর নেই। বিপাকে পড়লে মানত করেন। ভগবানের কথাই মনে এসে যায়। সৌমিত্র? 'ও বলে, কী করব, যা সাধ্যের বাইরে তার পিছনে ছুটে লাভ নেই।'

মিতিল ছবি আঁকে। তার বাবাও কখনো-সখনো মেয়ের পাশে বসে যান। হাতে তুলে নেন রং তুলি। শিল্পী মনের ছবি ফুটে উঠে।

চ্যাটারজি দম্পতি বেড়াতে ভালবাসেন। আগে বছরে দুতিনবার সপরিবারে বের হতেন। গত মে মাসে পুরী ঘুরে এসেছেন। সৌমিত্র নামী স্টার বলে পরিবারের লোকজনদের মূল্য দিতে হয় বই কি। একসঙ্গে পথেঘাটে বাজারে চলাই মুশকিল।

সৌমিত্র হিন্দি ছবির জগতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে কী হতো? দীপার জবাব: 'পুলুকে বিয়ে করার সময় ভাবিনি, আমাদের নিজস্ব গাড়িও থাকবে। এতো ভালভাবে থাকবো। তাই প্রত্যাশা নেই। মাঝেমধ্যে ভবিষ্যতের কথাও মনে আসে। হিন্দী ছবিতে গেলে হয়তো অঢেল টাকা আসতো। তবে মানিকবাবুর ছবির নায়কের চার্ম থাকতো না।'

যার আকর্ষণে এখনও পারিবারিক জীবনে বিভোর তার গুণ কী কী? 'সত্য আচরণ, সত্য বিশ্বাস এবং লোভহীনতা। কাজ পাগল। বিপদে ভেঙ্গে পড়ে না। অসম্ভব ভদ্র। কাছে এলে যেকোনো মানুষ এটা অনুভব করবেন।'

দীপারও কিন্তু রাগ হয়। যখন দেখেন সৌমিত্র কিছুতেই চক্ষুলজ্জা ছাড়তে পারেন না। ফলে বাইরে অনেক সময় ঠকতে হয়। মানুষটাকে নিয়ে যে কী করবেন চ্যাটারজি-গৃহিণী ঠাহর করতে পারেন না।

সৌমিত্র বিবাহ-বার্ষিকীতে জীবনের নায়িকাকে হীরের দুল বা সোনার হার দেননি। উপহার দিয়েছেন বই। এতেই দীপা তৃপ্ত। তবে পরম সুখী অন্য কারণে। মনেপ্রাণে তিনি জানেন, বোঝেন: চলচ্চিত্রের বিশ্ব-বন্দিত নায়ক ঘরোয়া জীবনে কখনো অভিনয় করেন না। ★

সাক্ষাৎকার: বিশ্বজিৎ সিংহ

আলোকচিত্র: এস রায়

পথ চলতি

দড়ি দিয়ে বাঁধা

আগে দেখতাম বছর চারেকের নগ্ন ছেলেটি বাবু হয়ে বসে আছে ফুটপাথের ওপর। সামনে একটা তেড়াবেঁকা কৌটো। কাছেই বসে অন্ধ মা। উদ্দেশ্য : দুই বাহুহীন অসহায় পুত্রের উদ্দেশে বর্ষিত সহৃদয় মুদ্রাগুলো সংগ্রহ করা।

সেদিন দেখলাম : মা বসে আছেন উবু হয়ে। সামনে কৌটো। হাতে একটা কালো



দড়ির এক প্রান্ত। অন্য প্রান্ত বেঁধেছে ছেলেটির কোমরে—পাছে সে হাত-ছাড়া হয়ে যায়। আর সেই ছোট্ট উলঙ্গ ছেলেটি কলকাতার ভরদুপুরে জনাকীর্ণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অন্য একটি সমবয়সী মুক্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসছে।

অনির্বাণ রায়

পথের গর্তে

দুর্গা, লক্ষ্মী ও কালীপুজো—বাঙালীর এই তিন প্রধান উৎসব কবেই মিটে গেছে। কিন্তু এখনো তার জের টেনে চলতে হচ্ছে হতভাগ্য ডাক্তারবাবু অন্নদামোহন বাগচীকে। রুগী দেখে ফিরছিলেন। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লোড শেডিং। হঠাৎ শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডের এক জায়গায় গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল পা। পা বেরও হল। কিন্তু একসরেতে ধরা পড়ল হাড় ভেঙ্গে গেছে। রুগী দেখতে গিয়ে ডাক্তারবাবুই এখন রুগী। বয়েসটাই গোলমেলে। সত্তরের কাছাকাছি। জীবনে আর রুগী দেখতে যেতে পারবেন কিনা কে জানে!



সরকার ফতোয়া দিয়েছিলেন, রাস্তা আটকে পুজো করা চলবে না। কিন্তু তা মানা হয়নি। বরং মণ্ডপ জেলুস করতে রাস্তায় শালকাঠের খুঁটিও পোতা হয়েছে ইচ্ছে মত। কিন্তু হায়, গর্ত বোঁজাবার দায়িত্ব কারও নেই।

বিজনকুমার ঘোষ

ক্রিকেট ও ইসলাম

সুপরিচিত ক্রিকেট সাংবাদিক গভীর মনোযোগে একটা বই ঘাঁটছিলেন। বললাম, 'কি, পাক-ভারত টেস্টের রেকর্ডবুক ঝালাচ্ছেন নাকি?'

: না মশাই, এটা হল লনডন থেকে সদ্য প্রকাশিত আয়াতুল্লা খোমেনির জীবন ও বাণী। দেখছি ভদ্রলোক ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বলেছেন কিনা।

: বলেন কি? ক্রিকেট সম্পর্কেও আয়াতুল্লার বক্তব্য থাকতে পারে নাকি?

: জানি না। তবে দেখা ভাল। ভারত ভ্রমণে আসবার ক'দিন আগে জিয়াউল



হক পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট বলেছেন এবং ঔপনিবেশিক নির্বাচন ব্যবস্থা ইসলামি আইনের আওতায় পড়ে না জানিয়েছেন। একজন ক্রীড়ামোদী আমায় কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন : ইসলামি আইনে কি ক্রিকেট খেলা বৈধ? কারণ সেটাও তো ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য থেকে এসেছে। তাহলে পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলা কি উঠে যাবে? মশাই ক্রীড়া সাংবাদিক হবার মহা ঝকমারি। আপনারা যখন শীতের নরম রোদ্দুরে বসে ফুলকপির সিঙ্গারা আর নলেন গুড়ের সন্দেশে কামড় বসাচ্ছেন আমি তখন কলম কামড়াচ্ছি আর ভাবছি ইসলামিক স্টেট ভারসাস কলোনিয়াল ক্রিকেট ট্রাডিশন।

নিবারণ চক্রবর্তী

বাপের চেয়ে বড়

কলকাতার পঁচিশ নং বুথে লাইনে দাঁড়িয়েও উনত্রিশ বছরের শ্যামলালের বুক দুরুদুরু। বাড়িতে যে ভোটার স্লিপ এসেছে তাতে বয়স লেখা উনষাট বছর। অথচ তার বাবারই বয়স সাতান্ন।

সেয়ানে সেয়ানে

পশ্চিমবঙ্গে ভোট গণনার প্রথম দিন। রাইটারস বিলডিংসের রোটানডায় নির্বাচনী কনট্রোল রুম। ত্রাণ ও উদ্বাস্তু মন্ত্রী রাধিকা ব্যানারজি ঢুকলেন। তাকে দেখেই এক সাংবাদিক প্রশ্ন ছুঁড়লেন : কাকে উদ্বাস্তু করতে এলেন? মন্ত্রীর সপাট জবাব : ইন্দিরা কংগ্রেসকে। রাধিকাবাবু পরক্ষণেই জানতে চাইলেন, তা আপনাদের কি খবর? টেবিলে রাখা সরকারি লাঞ্চ প্যাকেট দেখিয়ে একজন জবাব দিলেন : ফুড ফর ওয়ারক চলছে।

দেড় না সাত?

মধ্য কলকাতার বৌবাজারে একই ইসকুল বাড়িতে তিনটি বুথে পাশাপাশি ভোট। ছোট্ট উঠান। এরই মধ্যে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলা লাইন।

বহর দেখে এক ভোটার পাশের জনকে জিজ্ঞেস করলেন, আর কতক্ষণ লাগবে বলতে পারেন? জবাব : সামনে এগিয়ে ডানদিকে ঘুরে আবার এগিয়ে বামদিক ঘুরে এভাবে দেড় পাক।

কিছু দূরে দাঁড়ানো এক যুবক গলার স্বর চড়িয়ে বললেন, এ আর এমন কি! আমি তো সাত পাক ঘুরেছি।

কী করে? লাইনে দাঁড়ানো মানুষরা উৎসুক হলেন। এখানে তো অত পাক লাগবে না। তবে কি জাল ভোটার? বারবার ভোট দিচ্ছে? বলিহারি সাহস বটে—

মুচকি হেসে যুবকটি বললেন, কয়েকদিন আগে সাতপাক ঘুরে বিয়ে করেছি। তাই বলছিলাম।

বিশ্বজিৎ সিংহ

দরকারি ছদ্মনাম

কলকাতায় রীতিমতো নামকরা এক রাস্তার ওপর ডঃ সেনের ক্লিনিক ও ওষুধের দোকান। সেই ক্লিনিকে এখন আর ডঃ সেনকে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তার জামাই হেমন্ত সরকারকে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জামাই এর আসল নাম সেটা নয়। তার নাম হাফিজুল সামাদ। বুঝতেই পারছেন শ্বশুরের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্যেই তার এই ছদ্মনাম গ্রহণ। না হলে সে নিজে কিন্তু খুব বড় চাকরি করে। আর তার বউ স্নিগ্ধাও কলেজে পড়ায়। স্নিগ্ধা যখন বাবার ডাক্তারখানায় বসে তখনও তার নাম হয়ে যায় স্নিগ্ধা সরকার। তাদের একমাত্র মেয়ের নাম অবশ্য সত্যি সত্যিই ঝুমুর সামাদ।

যীশু চৌধুরী

ব্যঙ্গচিত্র : শান্তিশ্রী

ঘরোয়া

পরিচালনা নিবারন চক্রবর্তী

পরিবর্তনের পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ১৯৭৯ সালের ১ জুলাই সংখ্যা থেকে 'ঘরোয়া' আসরে শুরু হয়েছিল বিতর্কের নতুন প্রসঙ্গঃ 'আজকের বাংলা সাহিত্য কি সার্বিক অবক্ষয়ের পথে?' শিরোনামে। পরিবর্তনের বিগত চৌদ্দটি সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে যতগুলি চিঠি ছাপা হয়েছে প্রাপ্ত চিঠির সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। তবু বলতে দ্বিধা নেই: প্রসঙ্গটি যেমন গভীর ও ব্যাপক, অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা তত বেশি হয়নি। তার অন্যতম কারণ বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা দুটি ক্যাম্পে বিভক্ত হয়ে প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্য সুনিশ্চিত অবক্ষয়ের পথে অথবা অবক্ষয় আদৌ নেই। মূল সত্য কিন্তু এই দুই প্রান্তবাদী মতের মাঝখানে লুকিয়ে ছিল। বিতর্কের শিরোনামে 'সার্বিক' শব্দটি এবং 'অবক্ষয়ের পথে' উক্তিটি অনেকে বিবেচনা করে দেখেননি। বস্তুত কোন দেশের কোন সাহিত্যে কখনও সার্বিক অবক্ষয় হতে পারে না। তাহলে তো সৃষ্টিশীলতার মূল ধারাটিই অবরুদ্ধ হয়ে যেত। এই সঙ্গে আরো প্রণিধানযোগ্য ছিল, অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি ভেবে দেখা ও দেখানো।

যাই হোক, সাত মাস ব্যাপী এই বিতর্কের আসর পরিবর্তনের পাঠকগোষ্ঠী বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে আস্বাদন করেছেন। যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। যাদের চিঠি পত্রস্থ হয়েছে তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, অনেক সময় স্থানাভাবই অন্যান্যদের পত্র প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছে। গুণগত মানে ও বক্তব্য বিশ্লেষণের নতুনত্বে অমুদ্রিত অনেক পত্রই স্বচ্ছ ও মৌলিক ছিল। এবারকার বিতর্ক আমরা এখানেই শেষ করছি।

সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সদ্যসমাপ্ত বিতর্কে আমরা পাঠকদের কাজ থেকে চিঠি পেয়েছি মোট ১৮৮টি। তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ৪৭টি চিঠি। সবচেয়ে বেশি চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে মোট ৩০টি। জেলাওয়ারী পাওয়া চিঠি এইরকম: হাওড়া ২৪, মেদিনীপুর ১৭, নদীয়া ১০, বর্ধমান ১৪, মুরশিদাবাদ ৪, বীরভূম ৫, দার্জিলিং ৪, হুগলী ১২, পুরুলিয়া ৬, বাঁকুড়া ৩, মালদহ ২, কুচবিহার ৬, ২৪ পরগণা ২৭ এবং জলপাইগুড়ি ৭। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আসাম থেকে এসেছে সর্বাধিক চিঠি ১৬টি। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বিহার থেকে এসেছে ৫, মধ্যপ্রদেশ থেকে ২ এবং দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ড থেকে ১টি করে চিঠি। বাংলাদেশ থেকে এসেছে একখানি চিঠি। সুদূর ফ্রান্স থেকে এসেছে এক উৎসাহী বাঙালীর চিঠি। পত্র লেখকদের আঞ্চলিক বিস্তৃতি আমাদের উৎসাহিত করেছে।

কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে: 'আজকের বাংলা সাহিত্য কি সার্বিক অবক্ষয়ের পথে?' এ বিতর্কের সুষ্ঠু জবাব বা সংগত মীমাংসা আমরা পাইনি। একদল ধরে নিয়েছেন অবক্ষয়, আরেকদল বলেছেন অবক্ষয় নেই। আরেকদল বলেছেন সমাজে রাষ্ট্রে সর্বত্র আজ অবক্ষয় তাই সাহিত্যেও। আশ্চর্য যে, বেশির ভাগ পত্র-লেখক আজকের বাংলা সাহিত্য বলতে শুধু কথাসাহিত্য বুঝেছেন। কেউ কেউ ক্ষীণভাবে কবিতার কথা বলেছেন। নাটকের কথা অনুচ্চারিত থেকে গেছে। প্রবন্ধ, সমালোচনা সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, ব্যক্তিগত রচনা ইত্যাদি প্রায় বাদ থেকে গেছে।

যারা বলেছেন সাহিত্যে অবক্ষয় চলছে তারা বলেননি সুস্থ সাহিত্য কিভাবে মিলবে। আজকের সাহিত্যভাবনা ও সৃষ্টিতে প্রগতিগোষ্ঠীর ব্যর্থতার কথা কেউ তোলেননি। এ ব্যাপারে প্রগতিশীল-মার্কা পত্র-পত্রিকা অথবা রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথাও ওঠা উচিত ছিল। এককথায় বলা যায় প্রসঙ্গটির সামগ্রিক মূল্যায়ন অপেক্ষিত থেকে গেল। শুধু এসট্যাবলিশমেন্টকে গাল দিয়ে আর সাহিত্যিকদের অশ্লীলতা সৃষ্টির মনোবৃত্তিকে দোষারোপ করে আমরা কতদূর কি করতে পারবো? ভাল পত্রপত্রিকা কই? কোথায় সৎ প্রকাশক? অনুসন্ধানী সম্পাদকই বা কটা পত্রিকায় আছে? দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কি দেশের সাহিত্য সম্পর্কে কোন মনস্কতার পরিচয় রেখেছেন? অনায়াসে এবং অবাধে যে অশ্লীল পত্রপত্রিকা আর বই বিক্রি হচ্ছে তার প্রতিকার কি?

নতুন প্রসঙ্গ, নতুন বিতর্ক

এই সংখ্যা থেকে ঘরোয়া আসরে যে নতুন বিতর্কের সূচনা হচ্ছে তার প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষত শিক্ষা, কিন্তু পরোক্ষে আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গেও। বিতর্কের শিরোনামঃ **'ইংরেজি স্কুল আমাদের এখনও পরাধীন করে রেখেছে।'** বিষয়টি শুনেই কেউ তারিফ করে অথবা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে কলম ধরার আগে, অনুগ্রহ করে, চিঠি লেখার নিয়ম এবং আমাদের বক্তব্য জেনে নিন।

প্রথমে নিয়মাবলী। পরিবর্তনের যে কোন পাঠক, যে কোন বয়সী, এ বিতর্কে যোগ দিতে পারবেন। তবে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় হবে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য ও বিশ্লেষণ। অনধিক তিনশো শব্দের মধ্যে আপনার বক্তব্যটি লিখতে হবে। আসরে স্বনামে যোগ দেওয়াই ভাল তবে কেউ যদি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে চান তো করতে পারেন, তবে অতি অবশ্য নিজের নাম ঠিকানা জানাবেন আমাদের। আসরে মুদ্রিত প্রতিটি চিঠির জন্যে পনেরো টাকা সম্মান-দক্ষিণা যথাসময়ে ডাকযোগে পত্রপ্রেরককে পাঠানো হবে। চিঠি পাঠাবার সময়, দয়া করে খামের ওপর **'ঘরোয়ার জন্যে'** কথা কটি লিখে দেবেন।

এবারে নতুন বিতর্ক সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমত, পাঠকদের প্রতি নিবেদন, বিতর্কের শিরোনামে ইংরেজি স্কুল বলতে আমরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলিকে বোঝাচ্ছি। একথা তথ্যগতভাবে সত্য যে, দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশে (বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে) ইংরেজি স্কুল ব্যাঙের ছাতার মত বেড়ে চলেছে এবং এই স্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্যে চলছে অভিভাবকদের দিক থেকে লজ্জাকর রকম লালায়িতভাব এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতা। এইসব স্কুলের মাসমাইনে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকম বেশি হওয়া সত্ত্বেও বহু দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের সন্তানদের এইসব বিদ্যায়তনে পড়াবার জন্যে অমানুষিক প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ সবই আমাদের জাতিগত হীনমনতা ও অনগ্রসর চিন্তাভাবনার দ্যোতক। কোন স্বাধীন দেশে বিদেশী ভাষা ও সহবত শেখার ব্যাপারে এমন অত্যুগ্র আগ্রহ দেখায় বলে আমরা জানি না। একটা কথা স্পষ্ট ভাবেই বলা ভাল: আমরা ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির বিরোধী নই। কিন্তু ইংরেজির মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে এবং অনুকরণে মত্ত হয়ে নিজেদের ভাষা ও জীবনরীতিকে যে প্রতিক্ষেত্রে পদাঘাত করছি আমাদের প্রতিবাদ সেইখানে। ফলত, সদ্য-বুলি-ফোটা শিশুকে আমরা প্রথমেই শেখাই টা টা' বলতে। তারপর তাকে সদাচারে দীক্ষা দিয়ে 'থ্যাংক য়ু'-তে সড়গড় করি। তার প্রথম কাব্যপাঠ ঘটে 'টুইংকিল টুইংকিল' দিয়ে। তার সৌজন্য সম্বোধনের বোধোদয় ঘটে 'গুড মরনিং' বাক্যে। এরপরে সে শেখে ইংরেজিতে লেখা রামায়ণ মহাভারতের গল্প। মুখস্থ করে খৃস্টীয় সুসমাচার। বাতি জ্বালিয়ে জন্মদিন করে কেক কাটার সংস্কার সাধনের পর সুকুমারমতি বালক-বালিকা সোপ্রানো-কণ্ঠে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' গান গায়। এদের পোশাক-আশাক, উচ্চারণ, দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাব, স্মার্টনেসের চেষ্টাকৃত অনুকরণ ইত্যাদি আস্তে আস্তে আমাদের দেশের সামগ্রিক পটভূমিকায়, সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বড়ই বেমানান হয়ে যাচ্ছে। এদের কথাই কি ভেবেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজী বা আশুতোষ

মুখোপাধ্যায় ? বিলেত-না-গিয়ে-সাহেব এইসব বঙ্গ সন্তানরা হবে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাবিদ, মন্ত্রী ও প্রশাসক ? ভাবতে আতঙ্ক লাগে।

পাশাপাশি চিরায়ত বাংলা স্কুলগুলির দৈন্য ও হতদশা আমাদের মর্মান্তিক লজ্জা ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। বাংলা বিদ্যায়তনে পঠনরত ছাত্র সমাজের মলিনমুখ ও পরাজিতের মনোভাব দিন দিন পরিতাপজনক হয়ে উঠছে। আমরা কি করে ভুলবো যে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতিরা বাংলা স্কুলেরই ফসল। তাদের ইংরেজি জ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা কি কিছুমাত্র কম ছিল ? আমরা মনে করলে গর্ববোধ করি যে, বিলিতি সমাজে স্বীকৃত রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আমাদের প্রবাদ, ধাঁধা ও লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। ব্যারিসটার অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন ঃ 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি। আই. সি. এস গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহ করেছিলেন বিপুল সংখ্যক লোকশিল্পের নমুনা, পুনর্জীবিত করেছিলেন বাংলার লোকনৃত্যকে।

ইংরেজি শিক্ষা সুতরাং দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিবন্ধক নয়। পরাধীন ভারতে সর্বোচ্চ ইংরেজি শিক্ষিতের মধ্যে যে স্বাধীন দেশাত্মবোধ ও নিজের সংস্কৃতির প্রতি মমত্ব ছিল আজ স্বাধীন দেশে ইংরেজি বুলির বাকাবীরদের তার কণামাত্র আছে কি ? এরা এলভিস প্রিসলের গান জানে কিন্তু রজনীকান্তের গানে লজ্জা পায়। বেলট দিয়ে সরস্বতী পূজার দিনে ধুতি পরে। শুদ্ধ বাংলা ভাষায় দুদণ্ড কথা বলতে পারে না। দু'পংক্তি বাংলা লিখতে গেলে তিনটে বানান ভুল করে। তবু লজ্জা কই ? চৈতন্য জাগবে কবে ?

অবশ্য আমরা স্বীকার করি, ইংরেজি স্কুলে তথাকথিত স্মার্টনেস ও ডিসিপ্লিন রপ্ত হয়। ইনটারভিউ-ভিত্তিক চাকরিতে এসব নিশ্চয়ই কাজে লাগে। কিন্তু তাই বলে আমরা নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞার স্পর্ধা দেখাব ? ইংরেজি স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর স্ট্যাটাস সিম্বলের লোভে অভিভাবকরা আর কতদিন পরাধীন মনোভাবের পরিচয় রাখবেন ? কথায় বলে ঃ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। দেশের ও জাতির সার্বিক ও ভয়ংকর ধ্বংসের মুখে ইংরেজি স্কুলগুলি খুব দ্রুতগতিতে তৈরি করছে হাঁসজারুদের দল আর তাদের বেংলিশ সংস্কৃতি। ব্যাপারটি কি সুস্থ ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিচ্ছে ?

ওপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবারকার বিতর্ক বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি আমরা কতকগুলি প্রশ্ন রাখছি পাঠক-পাঠিকাদের বিবেচনা ও অংশগ্রহণের জন্যে। প্রথম প্রশ্ন, ইংরেজি স্কুলগুলি সম্পর্কে এখন কি করা উচিত ? এগুলি কি বেড়েই চলবে না অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া দরকার ? এসব স্কুলের খুব বেশি বেতন ব্যবস্থার নেপথ্যে যে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি রয়েছে তা কি চলতেই থাকবে ? কেউ কেউ একজন দু'জন অ্যাংলো ইনডিয়ান শিক্ষক বা শিক্ষিকা রেখে যে একরকম কিনডার-গার্টেন স্কুল চালাচ্ছেন ও ধোঁকা দিচ্ছেন তাদের সম্পর্কে কি করণীয় ? ইংরেজি স্কুলে পড়াতে গিয়ে বহু নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র অভিভাবক যে শোষিত হচ্ছেন এ সম্পর্কে কি করা যাবে ? ইংরেজি স্কুলে যারা পড়ছে তারাই কি স্মার্টনেস অর্জন করছে এবং তাদের চাকরির রাস্তা মসৃণ হয়ে যাচ্ছে ? উলটো দিক থেকে প্রতিপ্রশ্ন, বাংলা স্কুলগুলির মানোন্নয়নের জন্যে কি করা যায় ? ভবিষ্যতে বাংলা স্কুলে কি শুধু গরীবরাই পড়বে ? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, আমরা ডিসিপ্লিনড ও স্মার্ট হব, না দেশের সঙ্গে সংগতি রেখে গভীর হব এবং দরদী হব ? ইংরেজি স্কুলে শিক্ষালাভ করা সুসন্তানদের মধ্যে বাংলা ও বাঙালীর জন্যে আজ পর্যন্ত কে কতটুকু করেছে, সাহিত্য বা সংস্কৃতির উন্নয়নে ?

এইসব এবং এমনই সব প্রাসঙ্গিক বিতর্কের সূত্র আলোচনার জন্যে আমরা উদারভাবে পরিবর্তনের সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের ডাকছি ঘরোয়ার আসরে। মুক্তমন, স্বাধীন বুদ্ধি ও অমোঘ বিচার শক্তি সকলের সহায়ক হোক। জমে উঠুক আসর। সকলকে অগ্রিম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি। ★-

চার লক্ষ বছরের প্রাচীন মানুষের সন্ধানে

ত্রিপুরা বসু

ব্যাপারটিকে 'ঘটনা' না বলে 'দুর্ঘটনা' বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। কারণ নিয়ম-কানুনের পথ ধরে না চললেও যখন কোন অসম্ভব কিছু রহস্যের দ্বার খুলে যায়, তখন একে এছাড়া আর কিইবা বলা যাবে!

চীনের পিকিং শহরের পঞ্চাশ কিলো-মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ওয়েস্টার্ন পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্বে, দুদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি ছোট্ট পাহাড়ী শহর 'চাউকোটিয়েন।' সামনে দিয়েই বয়ে চলেছে 'পায়ের' বা 'পার' নামের ছোট্ট পাহাড়ী নদীটি। এর পশ্চিম তীরে আছে দুটি গোলাকার চূড়ার পাহাড়—চীনের ভাষায় এদের একটির নাম 'লুং কুশান' বা 'ড্রাগনের হাড়ের পাহাড়।' এই নামকরণের পেছনেও কারণ রয়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। স্থানীয় চুন-ভাটির শ্রমিকরা এখান থেকে চুনা পাথর সংগ্রহ করতে গিয়ে একসময় এখান থেকেই বেশ কিছু জীবাশ্ম আকস্মিকভাবে হাতে পায়। স্থানীয় মানুষ এগুলির নাম দেয় 'ড্রাগনের হাড়।' তা থেকেই পাহাড়টির এ হেন নামকরণ। বলা বাহুল্য, এগুলি কিন্তু আদৌ ড্রাগনের হাড় নয়। নৃতত্ত্বের অন্তর্গত 'সিনানথ্রোপাস' বিভাগের এক আদিম মানবেরই দেহাস্থি এগুলি। প্রায় চার লক্ষ বছর আগে এই আদিম জনগোষ্ঠী একদা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায় চীনের চাউকোটিয়েন শহরের আবিষ্কার থেকে। পিকিং শহরের কাছাকাছি স্থানের ব্যাপার বলে ঐ আদিম মানবগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক নামকরণ করা হয় 'সিনানথ্রোপাস পিকিনি-নেশিস' নামে। 'পিকিং মানব' ঐ নৃতাত্ত্বিক শব্দটির জনপ্রিয় পরিচিতি।

চাউকোটিয়েনের মূল্যবান পুরাক্ষেত্রের দিকে চীন দেশের পুরাতাত্ত্বিকদের প্রথম নজর পড়ে ১৯১৮ সাল নাগাদ। ঐ সময় আদিমজাতীয় কিছু পশু ও পাখির জীবাশ্ম চাউকোটিয়েন এলাকা থেকে পাওয়া গেলে স্থানীয় মানুষ পুরাক্ষেত্রটির নাম দেয় 'মুরগীর হাড়ের পাহাড়।' নৃতাত্ত্বিকরাও ব্যাপারটিকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। ১৯২১ সাল থেকে চাউকোটিয়েনের পুরাক্ষেত্রে আবিষ্কারের কাজ শুরু হয়। ১৯২৩ সালে এখান থেকে পাওয়া যায় আদিম মানুষের দুপাটি দাঁতের ফসিল। ১৯২৭ সালে পাওয়া গেল আরও একপাটি দাঁত। এভাবে এই তিনপাটি দাঁতের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব মহলে রীতিমত আলোড়ন পড়ে যায়। চাউকোটিয়েনের মূল্যবান 'রত্নভাণ্ডারে' বিজ্ঞান-সম্মত আবিষ্কারের কাজ শুরু হল ১৯২৭ থেকে। ১৯২৮এ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এখান থেকে হাতে আসে। ১৯২৯-এর ২ ডিসেমবর 'পিকিং মানবের' একটি আস্ত মাথার খুলি (Skull-cap)

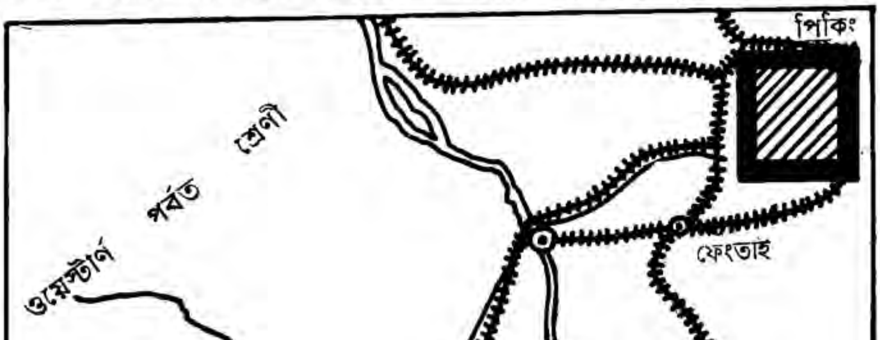


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন 'পিকিং মানবের' দেহাস্থি

চাউকোটিয়েনের ঐ চুনাপাহাড় থেকে পাওয়া যায়। আবিষ্কার-কাজের একজন উৎসাহী কর্মী এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযান সম্পর্কে তার দিনলিপিতে লিখেছেন এসব ঘটলো বিকেল চারটের পর। আমরা প্রায় তিরিশ মিটার গভীর একটি গর্ত খুঁড়েছি। গর্তের ভেতরে কোন রকমে তিনজন মানুষ দাঁড়াতে পারে। সেখানেই খুলিটিকে দেখা গেল। অর্ধেকটা নরম কাদায় আর অর্ধেকটা শক্ত পাথরের মধ্যে পোঁতা অবস্থায়। সূর্য তখন পাটে বসেছে। আমাদের দলের কর্মীরা আলোচনা করলেন—এটি আজকেই তোলা যাবে, না আগামীকাল সকালে পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। কিন্তু আমাদের আর ধৈর্য ছিল না। অবশেষে খোঁড়ার কাজ শুরু হল। তোলার সময় এর কিছুটা অংশ ভেঙে গেলেও মোটামুটি আস্ত ভাবেই এই মূল্যবান বস্তুটিকে মাটির গভীর থেকে উদ্ধার করে আনা হল। সে সময় আমরা কি ভীষণ আনন্দ যে পেয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না'। যে কোন একটি মানবগোষ্ঠীর জীবন ও সমাজের অনেক কিছু পরিচিতিই তার মাথার খুলি থেকে পাওয়া যায়। চার লক্ষ বছরের প্রাচীন পিকিং মানব সংক্রান্ত নানা রোমাঞ্চকর তথ্য তার এই প্রাপ্ত খুলিটি থেকেই পরে পাওয়া যায়।

একটা কথা বলা বাকি থেকে গেছে। এই যে আবিষ্কার বা খনন চলেছে, তা ঐ পাহাড়টির একটিমাত্র গুহাকে অবলম্বন করেই। এর ভেতরে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সঞ্চিত বিভিন্ন উপাদান আর অবক্ষেপ স্তরে স্তরে খনন করে খুব সাবধানেই এই আবিষ্কারের অভিযান চলতে থাকে।

১৯৩৭ সালে ঐ গুহার ভেতর থেকে পাওয়া যায় অনেকগুলি বিভিন্ন ধরনের



চাউকোটিয়েনের অবস্থান

জীবাশ্ম, পাথরের তৈরি নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, আগুন জ্বালানোর নানা উপকরণ ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু চীনদেশে তখন এক প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের শাসন চলেছে তাই চার লক্ষ বছরের প্রাচীন ঐ 'পিকিং মানব' সংক্রান্ত ব্যাপক অভিযান ও আলোচনা এক সময় দুর্ভাগ্যজনক ভাবেই থেমে যায়।

দীর্ঘ বারো বছর পরে ১৯৪৯ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং নব প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক সরকারের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে শুরু হয় অভিযান। সংশ্লিষ্ট গুহা ও তার কাছাকাছি স্থানগুলি খনন করে পাওয়া যায় পাথরের তৈরি অনেকগুলি অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন প্রাণীর হাড়, পিকিং মানবের আরো পাঁচটি দাঁত, ওপরের হাত ও ওপর পায়ের হাড়। স্বাধীন সরকার দেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও ঐ ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নানা স্থানে সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে যোগ দেন সারা দেশের পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ, ইতিহাসের গবেষক ও ছাত্র ছাত্রীগণ এবং দেশের অনেক সাধারণ মানুষও। ঐ সময় চাউকোটিয়েনের গুহা থেকে আবিষ্কৃত হয় মার্ক-গণ্ডার, লোমশ-গণ্ডার, চওড়া শিংওয়ালা বড় জাতের হরিণের ফসিল, চকমকি পাথরের তৈরি একটি ছেদন যন্ত্র, কৃত্রিমভাবে তৈরি কয়েকটি স্ফটিক প্রস্তর ইত্যাদি।

১৯৫৮ সালে 'পিকিং মানবের' গুহা নিবাসে যে নিবিড় খনন ও অনুসন্ধানের কাজ চলে, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণে তার গুরুত্ব যথেষ্টই। এর এক বছর পরে এখান থেকে পাওয়া যায় 'পিকিং মানবের' দাঁতের মাড়ির পূর্ণাঙ্গ অংশ এবং তার শরীরের নানা অংশের হাড়ের জীবাশ্ম। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে এই আবিষ্কারের কাজ চলে।

চাউকোটিয়েনের গুহা থেকে পাওয়া 'পিকিং মানবের' জীবাশ্মগুলির হিসাব


চার লক্ষ বছরের প্রাচীন একজন মানুষের মাথার খুলি

এইরকম ঃ

মাথার পূর্ণাঙ্গ করোটি	৬টি
খুলির হাড়ের টুকরো	৯টি
মুখগহ্বরের হাড়	৬টি
দাঁতের পাটির হাড়	১৫টি
দাঁত	১৫২টি
অন্যান্য হাড়	৭টি

সব মিলিয়ে মোট চল্লিশজন মানুষের শরীরের নানা অংশ এখান থেকে পাওয়া যায়। এইসব আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানতে পারা গেছে, পিকিং-মানবের কপাল ছিল অনুচ্চ, সমতল ও প্রশস্ত। তার মাথার খুলিটি ছিল পেছন ও সামনের দিকে কিছুটা ঝুলে থাকার মত—আধুনিক মানুষের খুলির চেয়ে দ্বিগুণ মোটা। ভুরুর হাড় চোখের ওপরে উঁচু হয়ে উঠে থাকতো। তার মুখমণ্ডলও বেশ প্রশস্ত ছিল।


১৯৬৬ সালে আবিষ্কৃত চার লক্ষ বছরের প্রাচীন মানুষের মাথার খুলি

ছোট আকারের দাঁতগুলি স্ত্রীলোক বা শিশুদের বলেই মনে হয়। দাঁতের আগা ও গোড়া ছিল বেশ মোটা আর অমসৃণ। তবে খুলির হাড়ের চেয়ে অন্যান্য হাড়গুলিকে বেশ উন্নত মনে হয়। তার হাত ও পায়ের গড়ন অনেকটাই আধুনিক মানুষের বলিষ্ঠ হাতের মতই ছিল বলে মনে হয়।

প্রশ্ন আসবে, পিকিং-মানব কি কথাবার্তা বলতে পারতো? নৃতাত্ত্বিকরা তার মাথার খুলির খাঁজগুলি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিশেষ ধরনের কোন ভাষার ব্যবহার হয়তো ছিল না, কিন্তু বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ করে সে ভাবের আদান প্রদান করতো।

অস্ত্রশস্ত্র তৈরির উপযোগী স্ফটিক শিলা, দাগকাটা কোয়ার্টজ, চকমকি পাথর, রঙীন মণি, বেলেপাথর ইত্যাদি কাছাকাছি এলাকা থেকেই পাওয়া যেত। আগুন জ্বালানোর কাঠকুটো তো হাতের কাছেই ছিল। কুঠার জাতীয় অস্ত্র ছাড়াও পিকিং-মানব কোয়ার্টজ পাথরের তৈরি এক ধরনের চাকতি ব্যবহার করত বোধহয় মুগুর বা লাঠিগুলিকে মসৃণ করার জন্যে। কিংবা খাদ্যবস্তু রাখার পাত্র হিসেবেও এগুলিকে হয়তো ব্যবহার করা হতো। কারও কারও মতে, শিকারের অস্ত্র ধারালো করতেই ঐ চাকতিগুলি ব্যবহার করা হত। এছাড়াও ছুঁচালো পাথরের ফলা, দা বা ছুরির মত কয়েকটি পাথরের খণ্ডও পাওয়া গেছে। এই সম্পর্কে পণ্ডিতজন বলেছেন, "In brief, the variety of Peking Man's stone implements, especially his points, and the level of skill he had achieved, are probably unmatched among comparable finds from that period."

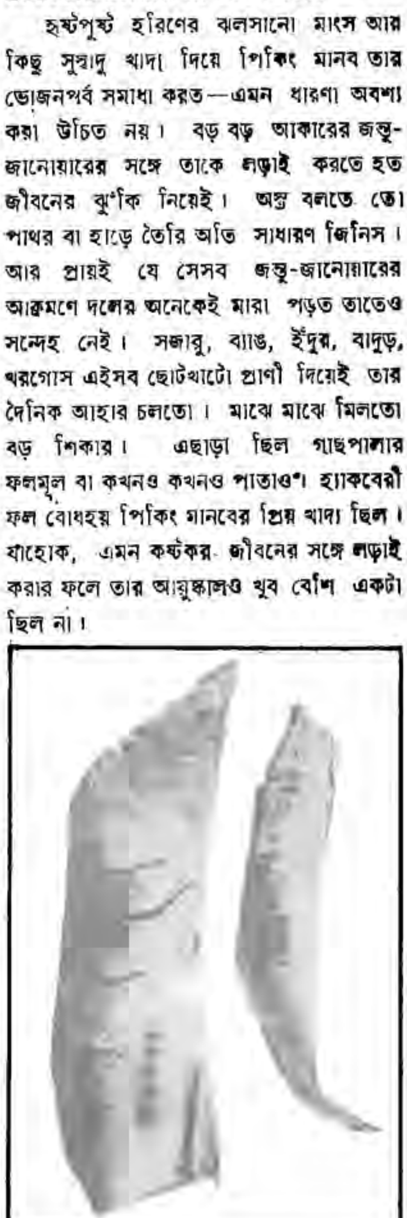
পাথর ছাড়াও শিং ও হাড়ের তৈরি অনেকগুলি অস্ত্র জাতীয় বস্তু চাউকোটিয়েনের গুহা থেকে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরিণের শিং। খননের উপযোগী বা কোন কিছুকে পেঁচিয়ে কাটার উপযোগী এ ধরনের কয়েকটি জিনিস পাওয়া গেছে। এগুলি দেখতেও যথেষ্ট শৌখিন।

চাউকোটিয়েনের গুহায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হল আগুন ও তার ব্যবহারের নানা নিদর্শন। চীন দেশের প্রাচীন বইগুলিতে বলা আছে 'সুই-যেন-শিহ' নামের এক আদিমতম মানুষ কাঠে গর্ত করেই আগুন জ্বালাতে শেখে। পিকিং-মানবের গুহা-নিবাস থেকে যে বিশাল পরিমাণ ছাই, আধপোড়া কাঠ বা কাঠকয়লা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, পিকিং-মানব এক বিশেষ পদ্ধতিতে

আগুন সংরক্ষণ করত। তা না হলে তো তার বেঁচে থাকাই অসম্ভব ছিল। আমাদের মনে হয়, আগ্নেয় উচ্ছ্বাস, লাভা-প্রবাহ বা কোন প্রাকৃতিক অগ্নিকাণ্ড থেকে সে আগুন সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ করতো। আগুনের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার সম্পর্কে পণ্ডিতজন বলেছেন, "When primitive men first saw a blazing fire with smoke rising in clouds and everything being burnt to ashes, they probably scurried for shelter in fright. Like other animals, many of them may have lost their lives in conflagrations. Being more developed than other animals, primitive men finally learnt from the better taste of roast meat that fire could be a force for good as well as for evil." কিন্তু কোন একজন চতুর মানুষের উদ্যোগে এটা সম্ভব হয়নি। এর জন্যে ব্যয় হয়েছে হাজার হাজার বছর। পিকিং-মানব আগুনকে তার জীবনচর্যার সঙ্গে নিবিড়ভাবেই সংযুক্ত করেছিল—অন্তত চাউকোটিয়েনের আবিষ্কার তাই প্রমাণ করে।

চার লক্ষ বছরের প্রাচীন 'পিকিং-মানব' চাউকোটিয়েনের রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশে যে এক শ্রমসাধ্য জীবন অতিবাহিত করতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার আবির্ভাবের আগে বা পরে বয়ে যায় কয়েকটি তুষার যুগ। গুহার ভেতরকার অবক্ষেপগুলিতে যেভাবে স্তর দেখা যায় তাতে মনে হয়, একাধিক সময়ে এক এক দল আদিম মানব ঐ গুহাতে বসবাস করে গেছে। ওখানকার আবহাওয়া ছিল শীতল, আর সামনেই ছিল জলাভূমি। দুর্গম অরণ্যে, পার্বত্যভূমিতে শিকারের খোঁজে ঘুরে ঘুরে, গাছপালার ফল-মূল ইত্যাদিতে পিকিং মানব জীবনধারণ করত। তার সেই জীবন সম্পর্কে মিঃ চিয়া-লান পো তার বইতে বলেছেন, "In the mountainous areas to the north and west of the present town of Choukoutien, mixed forests of pines, cedars, elms, hackbeerries, and Chinese redbuds were inhabited by such animals as big macacos, bisons, sabre-toothed tigers, leopards, brown bears, black bears, red dogs, racoon dogs and wolves. The lush growth of goosefoot, lilly, sagebrush and pyrola on the vast grassland to the southeast sheltered animals such as the cheetah, the horse, the wolly rhinoceros, the stripped hyena, the glutton, the sika deer and the elephant. There was a big river to the east of Dragon Bone Hill, and probably a lake as well. In the shallow water grew pond-wood, parrot feather and bull-rushes, and along the river banks and lake shore, willows made shady spots where the buffalo liked to wallow. In late autumn, thick-jaw deer migrated here. Otters, beavers and giant beavers swam in the river."

হৃষ্টপুষ্ট হরিণের ঝলসানো মাংস আর কিছু সুস্বাদু খাদ্য দিয়ে পিকিং মানব তার ভোজনপর্ব সমাধা করত—এমন ধারণা অবশ্য করা উচিত নয়। বড় বড় আকারের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হত জীবনের ঝুঁকি নিয়েই। অস্ত্র বলতে তো পাথর বা হাড়ে তৈরি অতি সাধারণ জিনিস। আর প্রায়ই যে সেসব জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণে দলের অনেকেই মারা পড়ত তাতেও সন্দেহ নেই। সজারু, ব্যাঙ, ইঁদুর, বাদুড়, খরগোস এইসব ছোটখাটো প্রাণী দিয়েই তার দৈনিক আহার চলতো। মাঝে মাঝে মিলতো বড় শিকার। এছাড়া ছিল গাছপালার ফলমূল বা কখনও কখনও পাতাও। হ্যাকবেরী ফল বোধহয় পিকিং মানবের প্রিয় খাদ্য ছিল। যাহোক, এমন কষ্টকর জীবনের সঙ্গে লড়াই করার ফলে তার আয়ুষ্কালও খুব বেশি একটা ছিল না।



চার লক্ষ বছরের প্রাচীন প্রাণীর অর্ধদগ্ধ হাড়

মৃত্যুকালের মোটামুটি বয়স	আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফসিলের শতকরা হিসাব
১৪ বৎসরের কম	৩৯.৫
১৫ বৎসর—৩০ বৎসর	৭.০
৪০ বৎসর--৫০ বৎসর	৭.৯
৫০ বৎসর—৬০ বৎসর	২.৬
যেগুলির বয়স বোঝা যায়নি	৪৩.০

প্রায় চার লক্ষ বছরের প্রাচীন এই আদিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যেসব তথ্য জানতে পারা গেছে পৃথিবীর নৃতাত্ত্বিকগণ সেগুলিকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে রাজি নন। আরো নতুন কিছু তথ্যের জন্যে তারা অপেক্ষা করতে আগ্রহী। সারা চীন দেশের নানা স্থানে সেই রহস্য ভেদের উদ্দেশ্যে চালানো হয়েছে পুরাতাত্ত্বিক অভিযান। আপাতত সেই রকম একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেই চার লক্ষ বছরের প্রাচীন মানব-গোষ্ঠী 'পিকিং মানব' বা 'সিনানথ্রোপাস পিকিনিনেসিস' সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানবো—

১। য়ুনান প্রদেশের কাইউয়ান কাউনটির শিয়ালুংগটান (১৯৫৭): প্রায় দশ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের পাঁচটি দাঁতের ফসিল।

২। য়ুনান প্রদেশের য়ুয়ানমাউ কাউনটির গ্রামাঞ্চলে (১৯৬৫): দশ লক্ষ বছর বা তারও বেশি আগেকার মানুষের দুটি দাঁতের ফসিল।

৩। শানসী প্রদেশের জুইবেং কাউনটির শিহুতু গ্রাম (১৯৬১-৬২): দশ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের ব্যবহৃত কিছু পাথরের দ্রব্যাদি।

৪। শানসী প্রদেশের জুইবেং কাউনটির কেহো গ্রাম (১৯৬০): পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের ব্যবহৃত পাথরের কুঠার, দা, বর্শার ফলা ইত্যাদি।

৫। শানসী প্রদেশের লানটিয়েন কাউনটির চেমবিয়াউ ও কুংওয়াংলিং গ্রাম (১৯৬৩-৬৪ খৃঃ): আদিম 'লানটিয়েন' মানবের দাঁতের হাড়, মাথার খুলি, কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবাশ্ম, কয়েকটি পাথরের অস্ত্র। এই মানবগোষ্ঠী 'পিকিং-মানবের' পরের যুগে পৃথিবীতে ছিল।

৬। কুইবো প্রদেশের চিয়েনসি কাউনটির শাউ গ্রামের কুয়ানয়িন গুহা (১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৭২): কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবাশ্ম, পাথরের কয়েকটি অস্ত্রশস্ত্র।

● আকর গ্রন্থ: চিয়া লান-পো'র 'দি কেভ হোম অব পিকিং ম্যান।'

মালাঞ্জখণ্ডের ছয় পাহাড়ের রহস্য ● সঙ্কর্ষণ রায়

সুপারইনটেনডিং জিয়োলজিসট ঘ – সাহেব খুব ভাবনায় পড়েছেন। তার অধস্তন সিনিয়র জিয়োলজিসট আর কে শর্মা মধ্য-প্রদেশের মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড় ছেড়ে নড়তে চাইছে না। এই ছয়-পাহাড়ের গ্র্যানিট পাথরের পাঁজার মধ্যে কী মধুর সন্ধান পেয়েছে সে কে জানে।

মধু অবশ্য সে খুঁজছে না, খুঁজছে খনিজ। তার লক্ষ্য ধাতুযুক্ত খনিজ। ধাতু মানে লোহা ছাড়া যে কোনও ধাতু। সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা, বা তামা, যে কোনও ধাতুর সম্ভাবনা নাকি উহ্য আছে এই ছটি পাহাড়ের আড়ালে। কিন্তু পাহাড়গুলোর গায়ে তার



রহস্যময় পাহাড়—খনিজের আকর

বিশেষ কোন চিহ্ন নেই।

পাহাড়গুলো গড়ে উঠেছে গ্র্যানিট (granite) পাথর দিয়ে। গ্র্যানিট অবশ্য শুধু এই পাহাড়গুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তা,এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েও বিরাজ করছে। একই গ্র্যানিট এই ছয়-পাহাড়কে গড়ে তুললেও পাহাড়গুলোর মধ্যে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তা হল গ্র্যানিটের লালচে বাদামী রঙের স্তূপকে বিদীর্ণ করে ওঠা সাদা কোয়ার্টজ এর (quartz) শিরা উপশিরা। কোন কোন ভূতাত্ত্বিক ভেবেছেন, কোয়ার্টজ-এর এই সব শিরা উপশিরাই ধাতুর বাহন—অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ গলিত শিলার আঠার ম্যাগমা (magma) থেকে বিশেষ কোন একটি ধাতুকে বহন করে নিয়ে এসেছে এই ছয় পাহাড়ের মধ্যে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে যেখানে তারা আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে সেখানে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালিয়েও বিশেষ কোন ধাতুর চিহ্ন তারা খুঁজে পাননি। জায়গায় জায়গায় কিছু তামাযুক্ত ম্যালেকাইটের (malachite) সবুজ ছোপ, লোহাযুক্ত লিমোনাইটের বাদামী স্তর—এ ছাড়া আর কিছুই নেই। ম্যালেকাইট-এর সবুজ ছোপ গাছপালার সবুজ আবরণের মতোই প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনের বহু জায়গায় বাদামী ও ধূসর রঙের শিলাপটে আঁকা ছবির মত বিরাজ করছে। পাথরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু তামা সর্বত্রই আছে, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তারা এই সব সবুজ ছবিতে রূপান্তরিত। কিন্তু তাদের দেখে পাথরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন তামাযুক্ত খনিজের ভাণ্ডারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

আর লিমোনাইটের বাদামী প্রলেপ? মাটি ও পাথরে তা সর্বত্রই দেখা যায়। লাল মাটি ও ক্ষয়ে যাওয়া পাথরকে জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত লোহা মরচের মত আচ্ছন্ন করে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রায় সবরকম খনিজ ও শিলাতে লোহা থাকে—জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় তা খনিজ ও শিলা-স্তরের রাসায়নিক বুনন থেকে বিযুক্ত হয় এবং সৃষ্টি করে লিমোনাইট-এর আবরণ—অনেক জায়গায় তা জমে জমে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড়েও তা আছে, আছে সব কটি পাহাড়কেই আচ্ছন্ন করে। তা দেখে পাহাড়ের আড়ালে কোন ধাতু বা খনিজ আছে তা আন্দাজ করা কঠিন।

ম্যালেকাইট বা লিমোনাইট এর মধ্যে কোন স্পষ্ট হদিস না থাকলেও ছয়-পাহাড়ে কয়েকটি প্রাচীন খনির গহ্বর দেখা যায়। বালাঘাটের ডেপুটি কমিশনার কর্নেল ব্লুকম ফিলড ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাদের আবিষ্কার করেন এবং চিনতে পারেন প্রাচীন খনির অবশেষ বলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার ডিরেকটরকে অনুরোধ করেন সেগুলো পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে। ডিরেকটর ব্লুকমফিলডের চিঠি পাওয়া মাত্র সেখানে পাঠালেন ডবলিউ কিংকে। বালাঘাট থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে ঘন বন দিয়ে বেষ্টিত মালাঞ্জখণ্ড তখন শিকারীদের কাছেও দুর্গম ছিল। বনের মধ্যে অন্যান্য বন্য প্রাণীর সঙ্গে ছিল অসংখ্য বাঘ ও বাইসন। মালাঞ্জখণ্ডের ছয় পাহাড়ের পাহারাদার যেন তারা। তাদের প্রতিরোধ ভেদ করতে গিয়ে বহু বাঘ ও বাইসন হত্যা করলেন কিংসাহেব। বাঘ-বাইসনের বেষ্টনী পেরিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছলেন তিনি ছয়-পাহাড়ে, কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না তার রহস্য। প্রাচীন খনি গহ্বরগুলো পরীক্ষা করলেন তন্ন তন্ন করে কিন্তু কোন খনিজ বা ধাতুর গুপ্ত ভাণ্ডারের অভিমুখে তারা প্রসারিত হয়েছে তিনি বুঝতে পারেন না।

ডবলিউ কিং-এর পর আরও অনেক ভূতাত্ত্বিক এই ছয় পাহাড়ের খনি-গহ্বর-গুলোকে পরীক্ষা করেছেন। ধস নেমে গহ্বরগুলোর সুড়ঙ্গ পথগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে কাজেই গহ্বরের মধ্যে ঢুকে ভেতরের খবর নেবার সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ভেতরে বেশিদূর যেতে না পারলেও তারা অবশ্য বুঝতে পারেন যে খনন চলেছিল কোয়ার্টজ এর শিরা উপশিরাকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ গ্র্যানিট পাথরের মধ্যে উদভেদিত এই কোয়ার্টজ এর শিরার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধাতু বা খনিজের ভাণ্ডারকে লক্ষ্য করেই প্রাচীন খনিবিদদের কর্মতৎপরতা চলেছিল।

খনি-গহ্বরগুলোর মধ্যে প্রাচীন খনি-বিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়, অতএব নতুন করে খননের আয়োজন করা হল। এর জন্য সমবেত হলেন কয়েকজন ভূতাত্ত্বিক এবং খনিবিদ। তাদের যৌথ প্রয়াসে ছয় পাহাড়ে কোয়ার্টজ-এর শিরা বেয়ে খননের কাজ শুরু করা হয়। লিমোনাইট এবং বিরল কিছু ম্যালেকাইটের ছোপ নিয়ে কোয়ার্টজ-এর শিরা গ্র্যানিটের স্তূপ বিদীর্ণ করে ভূগর্ভের দিকে প্রসারিত হয়েছে। লিমোনাইট অবক্ষয়ের প্রতীক—জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় পাথরের স্তর থেকে বিযুক্ত লোহা ক্ষয় পাওয়া পাথরের গায়ে প্রলেপের মত বিরাজমান। পাহাড়ের ওপর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মিটার গভীর পর্যন্ত এই অবক্ষয়ের কোন শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই কোয়ার্টজ এর শিরা বেয়ে অনির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত একটি ফাটল প্রসারিত হয়েছে, যার দরুন এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায় তা নিরূপণ করা তাদের সাধ্যের অতীত।●

অতএব মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড় থেকে তারা বিদায় নিলেন এবং তাদের রিপোর্ট লিখলেন, খোঁজাখুঁজি বা খোঁড়াখুঁড়ি করে কোন লাভ নেই, অবক্ষয়ের শেষ কোথায় তা জানতে একমাত্র ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরাই পারবেন।

এরপর আসরে নামলেন ভূপদার্থ বিজ্ঞানীরা (Geophysicist)। মালাঞ্জ-খণ্ডের ছয়-পাহাড়ের মাথায় যন্ত্রপাতি বসিয়ে ভূগর্ভের দিকে তারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিক্ষেপ করলেন। কোয়ার্টজের শিরা বেয়ে তা নীচে নামল এবং কোন এক বিশেষ স্তরে প্রতিফলিত হয়ে উঠে এল ওপরে। এই প্রতিফলিত

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিশেষ একটি গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে ভূগর্ভের স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তোলে। গ্রাহক-যন্ত্রের কাঁটায় যা ফুটে ওঠে তা থেকে বোঝা যায় যে প্রতিফলনের স্তর (layer of reflection) পর্যন্ত কোয়ার্টজ-এর শিরা কোন নির্দিষ্ট ধাতু-রূপ প্রাপ্ত হয়নি, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গও পারেনি অবক্ষয়ের সীমা পেরোতে।

অতএব ভূপদার্থবিজ্ঞানীরাও ব্যর্থ হলেন পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞদের মতো। রিপোর্টে লেখা হল, মালাঞ্জখণ্ডের ছয়-পাহাড়ে প্রাচীন খনি-বিদরা কিসের অন্বেষণে মেতেছিলেন তা জানা যায় না, হয়তো যাবেও না কখনো। বোধ হয় সোনার হরিণের মতই অসম্ভবের পেছনে মাথা কুটেছিল তাদের সব প্রয়াস।

এরপর ঐ ছয়-পাহাড়ে কোন ভূতাত্ত্বিকেরই পদার্পণ ঘটা উচিত ছিল না। সব বিশেষজ্ঞই যেখানে ব্যর্থ, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই সেদিকে পা বাড়ানো উচিত নয়।

কিন্তু উচিত অনুচিত বিবেচনা করে না এমন মানুষ বিরল নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। যে যাই বলুক, তারা পথ দেখে নিজেদের অন্তর্দৃষ্টির আলোয়। অপরের মতামত বা পূর্ববর্তীদের ক্রিয়াকলাপের কাছে বিনা শর্তে কখনোই আত্মসমর্পণ করে না তারা। অনুসন্ধানের নেশায় তারা পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক ফলাফলকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে চায়। এই সব বিরল সন্ধানের নেশায় মাতা বিজ্ঞানীদের অন্যতম আর কে শর্মা পূর্ববর্তীদের নেতিবাচক সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে মালাঞ্জখণ্ড পাহাড়কে নতুন করে পরীক্ষা করতে চাইল। তার ওপরওয়ালা ঘ—সাহেব তার প্রস্তাব মঞ্জুর করতে পারেন না, তিনি তাকে বোঝান যে যেখানে বহু ভূবিজ্ঞানী ব্যর্থ হয়েছে সেখানে নতুন করে কাজ করতে চাওয়াটাই পাগলামি। কিন্তু শর্মা নাছোড়বান্দা, ঘ—সাহেবকে সে বললে মালাঞ্জখণ্ড পাহাড়ে তাকে কাজ করতে দেওয়া না হলে আর কোন কাজই করবে না সে—বাধ্য হবে পদত্যাগ করতে। অগত্যা ঘ সাহেব অনুমোদন করেন তার কর্মসূচী।

বালাঘাট থেকে যাত্রা করে শর্মা তার জীপে করে এল বাইহার। তারপর পেরিয়ে আসে ঘন বন। ডবলিউ কিং-এর সময়কার বাঘ ও বাইসনদের প্রাধান্য এখন নেই, তথাপি বনের ঘনত্ব প্রায় আগের মতোই আছে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে এই বন অদৃশ্য হয়েছে মালাঞ্জ-খণ্ড পাহাড়ের চারপাশে। বনের সীমা পেরিয়ে বিরসা গ্রামে পৌঁছতেই চোখে পড়ে বনশূন্য পাহাড়—চারপাশের সমতলভূমির বুক ফুঁড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।' বনের একটানা সবুজ উত্তরীয় এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ছয়-পাহাড়ের ঢেউ খেলানো লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়কে অপাবৃত করেছে। ছয়-পাহাড় আসলে একই পাহাড়ের ছটি চূড়া। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত একটানা ঐক্যবদ্ধ বিন্যাস পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে।

শর্মা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই ছয়-পাহাড়ের দিকে। তার নোট বইয়ে সে লেখে ছয় পাহাড় উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে প্রসারী একটি ঐক্যবদ্ধ ভূতাত্ত্বিক গঠনকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। লম্বায় পাঁচ এবং চওড়ায় আধ কিলোমিটার এই পাহাড় যেন পাহাড়-প্রমাণ খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারকে চাপা দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু চাপা দিয়ে রাখা এই খনিজ বা ধাতুর ভাণ্ডারের কোন চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে কোথাও ফুটে ওঠেনি। শর্মা লিখল, চোখে পড়ার মত চিহ্ন বলতে আছে প্রাচীন এই সব খনি গহ্বর—তা ছাড়া আছে এই পাহাড় ও তার বিশেষ বিন্যাস···

—ধাতু বা খনিজের ভাণ্ডারের প্রমাণ এই গর্তগুলো! ঘ—সাহেব অবাক হয়ে তাকান শর্মার মুখের দিকে : পাহাড়ের বিন্যাস খনিজ ভাণ্ডারের বিন্যাসকে ফুটিয়ে তুলছে বলতে চাও! কোন ভূতাত্ত্বিকই তোমার এই সব অলীক কল্পনাকে মেনে নেবে না শর্মাজী!

—অলীক কল্পনা কাকে বলছেন স্যার! এদেশে এমন কোন খনি নেই যেখানে প্রাচীন খনির চিহ্ন নেই! কোলারের সোনা, সিংভূম ও খেতরির তামা, জাওয়ার-এর সীসা ইত্যাদি বহু খনিই প্রাচীন খনিবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। আমার ধারণা এদেশের সব কটি সোনা ও তামার ভাণ্ডারকে প্রাচীন খননকারীরা চিনে নিয়েছিল।

—সে না হয় হল। মাথা চুলকে বললেন ঘ—সাহেব : কিন্তু পাহাড়ের বিন্যাস দিয়ে খনিজ ভাণ্ডারকে চিনতে যাওয়াটা পাগলামি নয় কী?

—খনিজ ভাণ্ডারের সঙ্গে শিলাবিন্যাসের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। শর্মা বললে, শিলাবিন্যাস প্রতিফলিত হয় পাহাড় পর্বতের বিন্যাসের মধ্যে। অতএব, পাহাড়-পর্বতের বিন্যাসের মধ্যে প্রকৃতির অনেক গোপন কথাই উহ্য আছে···পাহাড় শুধু পাহাড় নয় স্যার···

এর পর আর কোন কথা বলেন না ঘ—সাহেব, শর্মা বিনা বাধায় চালিয়ে যায় তার কাজ।

শর্মার হঠাৎ খেয়াল হল বুঝি ঐ পাহাড়ের মাথায় মাটির স্তরের মধ্যে কোন গোপন হদিস প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধাতু বা খনিজ ক্ষয়ে গিয়ে মাটির তলায় জলের সঙ্গে মিশে ওপরকার মাটির স্তরে এসে পৌঁছেছে। অতএব শুরু করে সে দশ পনেরো মিটার অন্তর অন্তর মাটির নমুনা সংগ্রহ।

ঐ মাটির নমুনাগুলো নাগপুরের ল্যাবোরে-টারিতে নিয়ে গিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর সমাবেশ পাওয়া গেলেও বিশেষ কোন ধাতুর সমাহরণ (concentration) দেখা যায় না। তবে অন্যান্য ধাতুর তুলনায় তামার যৎকিঞ্চিৎ আধিক্য লক্ষ করে শর্মা। ঘ—সাহেবকে এই রাসায়নিক বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাঠিয়ে সে লিখল, মাটির ওপরে স্পষ্ট লক্ষণ দেখা না গেলেও ভূগর্ভে বিপুল ভাণ্ডারের আভাস পাচ্ছি। সম্ভবত তা তামারই ভাণ্ডার। আমার অনুমান, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় ভূগর্ভে বহুদূর পর্যন্ত তামাযুক্ত খনিজ থেকে তামা বিযুক্ত হয়েছে। তামা অপসৃত হওয়াতে অবশিষ্ট থেকেছে লোহা। সেই লোহা সৃষ্টি করেছে লিমোনাইট। আমাদের পূর্ববর্তীদের খননক্রিয়া সীমাবদ্ধ থেকেছে এই লিমোনাইট-এর মধ্যে। ড্রিলিং করে এই লিমোনাইট-এর সীমা পেরিয়ে আমরা তামার গুপ্ত ভাণ্ডারে পৌঁছতে পারি।

ড্রিলিং মানে যন্ত্রের সাহায্যে শিলাস্তর বিদীর্ণ করা। লিমোনাইট হল শিলাক্ষয়ের অবশেষ। শিলাক্ষয়ের সীমা পেরিয়ে মূল খনিজের স্তরে পৌঁছতে হলে কতখানি গভীর পর্যন্ত ড্রিলিং করতে হবে তা জানা নেই। অনির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত ড্রিলিং করার এই প্রস্তাব তাই মনঃপূত হয় না ঘ-সাহেবের। কিন্তু শর্মা নাছোড়বান্দা, কাজেই শেষ পর্যন্ত তার প্রস্তাবে অনুমোদন দিতে বাধ্য হন ঘ-সাহেব।

শুরু হল ড্রিলিং। ছয়-পাহাড়ের গায়ে বসানো ড্রিলিং মেশিন বিদীর্ণ করে গ্র্যানিট-এর কঠিন আবরণ। ড্রিল রড (drill rod) এমনি কোনাকুনিভাবে গ্র্যানিট-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে যাতে তা কোয়ার্টজ-এর শিরাকে অবক্ষয়ের সীমার নীচে বিদীর্ণ করতে পারে।

গ্র্যানিট এর কঠিন স্তরগুলি ভেদ করে নীচে নামতে থাকে ড্রিল রড—রুদ্ধশ্বাসে তার অগ্রগতিকে লক্ষ করে শর্মা। গ্র্যানিটের ষাট সত্তর মিটার বিদীর্ণ করে তা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। এরপর পাথরের বিন্যাস থেকে হিসেব করা প্রায় প্রত্যাশিত গভীরতার মধ্যে কোয়ার্টজ এর শিরাকে স্পর্শ করে।

কোয়ার্টজ-এর শিরাকে শুধু নয়, তার সঙ্গে সহ-অবস্থিত তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইটকেও স্পর্শ করে ড্রিলিং রড। চ্যালকোপাইরাইট-এর (chalcopyrite) স্তরটাকে রীতি মত চওড়া বলে মনে হয় শর্মার। ড্রিলিং রড তাকে বিদীর্ণ করতে গিয়ে একটা বিপুল আকারের তামার ভাণ্ডারকে উদঘাটিত করে।

এই জায়গাটি ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গায় ড্রিলিং মেশিনের রড গ্র্যানিট ভেদ করে চ্যালকোপাইরাইট-এ উপনীত হয়। ব্যাপারটি রীতিমত উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বনের সীমা পেরিয়ে তার খবর পৌঁছে যায় লোকালয়ে,-পৌঁছে যায় কলকাতা, নাগপুর, জয়পুর, লখনউ, হায়দ্রাবাদ ও শিলঙে।

এমনি করে মালাঞ্জখণ্ড এর ছয়-পাহাড়ের অন্তরালে বিপুল তামার ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয় সেখানে আয়োজন হয় খনি-পত্তনের। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে তৈরি করা হয় খনির পরিকল্পনা···। ধরা পড়ে প্রকৃতির লুকানো ভাণ্ডার মানুষের সন্ধানী চোখে। ★


আবিদ সুর্তি
সুজা
১২
ওরা আদিম উল্লাসে নাচছিল।
বিন্দু! তুমি কাঁদছ?
আমিই এজন্যে দায়ী....
কেন?
আমার বোকামির জন্য তোমাকেও মরতে হচ্ছে।
থামোতো। শোনো যা বলছি—
সুজা বিন্দুর কানে কানে কী বলল।
তক্ষুণি বিন্দু তারস্বরে চীৎকার করল—
নাচ থামাও!
হঠাৎ থমকে গেল সবাই।
কী বলতে চাস্?
আমি....আমি বিয়ে করব।
কাকে?
12-17
রাজার রাজা সুজাকে?
সকলের নজর সুজার দিকে।
সুজা যাকে বলবে তাকে বিয়ে করব।
(ক্রমশঃ)

ভারতের হকি দল মসকো অলিমপিকে ঠাঁই পাবে কি ?

শাক্যদেব

ভারতীয় হকি ক্রমেই চরম দারিদ্র্যের দিকে পা বাড়াচ্ছে। ঠিক যেমন ভাবে একটা স্বাস্থ্যবান যুবক ভুল চিকিৎসার জন্যে দিনদিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। একটা বিরাট বনেদী পরিবার অর্থাভাবে যেমন ক্রমেই তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে, ভারতীয় হকি তেমনভাবেই এগিয়ে চলেছে। এগোনো না পিছনো ? পিছতে পিছতে পাতাল এগোতে এগোতে মহাপ্রস্থান—ভারতীয় হকির যাত্রা এখন দুমুখোই।

করাচিতে দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকির ইজ্জতটুকু লুণ্ঠিত। গত বছর লাহোরে বসেছিল এই প্রতিযোগিতার প্রথম আসর। ভারত তাতে যোগ দেয়নি। নিজের দেশে অন্য কাউকে মস্তানি করার সুযোগ না দিয়ে পাকিস্তান জয়ী হয়েছিল। এ বছর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বর্ষেও পাকিস্তান জিতে অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছে দক্ষিণ এশিয়া এখনও বিশ্ব হকির শাহেনশা।

করাচি হকি অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে লোক বসে ২৫ হাজার। পাকিস্তান ভারতের থেকেও দরিদ্র। অথচ ইচ্ছাশক্তিতে ওরা অনেক কিছুই জয় করতে পারে। আন্তর্জাতিক হকির মান ধরে রাখতে ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে করাচি হকি অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে অ্যাসট্রো টারফ পাতা হল। এর পেছনে পাকিস্তান ইনটারন্যাশন্যাল এয়ারলাইনসের অবদানও কম নয়। তারাই এই প্রতিযোগিতা স্পনসর করেছে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল সাতটি দেশ। পাকিস্তান ও ভারত ছাড়া এসেছিল পশ্চিম জারমানি, অসট্রেলিয়া, হল্যানড, স্পেন এবং ইংল্যানড।

ভারতের কপালটা যে মন্দ ছিল তার প্রমাণ মেলে শুরুর সময়েই। প্রথম দিনেই খেলা পড়ে পাকিস্তানের সঙ্গে। ভারতের কাছে পাকিস্তান এখন জুজু বনে গেছে। ৭৮ পাক-ভারত হকি টেসটে ভারত হেরেছিল ৬-০ গোলে। সেই স্মৃতিটিকে জাবর কাটতে কাটতে উদ্বোধনী দিনে খেলতে নেমে ভারত বিধ্বস্ত হয় পাক বাহিনীর লাঠির ঘায়ে ৭-১ গোলে হেরে ভারতীয়রা প্রথমেই এমন ধাক্কা খেল যার ঘা শুকোতে দীর্ঘদিন চিকিৎসার প্রয়োজন।

পরের দিনই খেলা ছিল শক্তিশালী অসট্রেলিয়ার সঙ্গে। গত পাঁচবছরেই বিশ্ব হকিতে অসট্রেলিয়া প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে চলে এসেছে। এ খেলায় ভারতের শুরুটা ভালই হয়েছিল। বিরতির সময় ভারত জিতছিল ৩-১ গোলে। খেলা যখন শেষ হয় দুপক্ষই তখন সমান সমান। ৩-৩ গোলে খেলা ড্র।

তৃতীয় খেলায় প্রতিপক্ষ ছিল স্পেন। এ খেলাটি জেতা উচিত ছিল ভারতের। কিন্তু পেনালটি স্ট্রোকের সদ্ব্যবহার করতে না পারায় ২-২ গোলে খেলা ড্র হয়।

চতুর্থ খেলায় ভারতের জেতার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। শক্তিশালী হল্যানড চকাচক স্কোর করে জিতল ৬-২ গোলে। পঞ্চম খেলায় পশ্চিম জারমানিকে হারাতে হারাতে হেরে বসল ৩-৪ গোলে। এই পর্যন্ত ভারতের পয়েনট পাঁচটি খেলে দুই। সেটি কিছুটা ভদ্রস্থ হল শেষ খেলায় ইংল্যানডকে ৬-৩ গোলে হারিয়ে। চূড়ান্ত পয়েনট ছটি খেলে চার।

দিনদিন ভারত হকিতে কেমন দীন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে একটু আশার আলো দেখা যায়। '৭৬-এর মনট্রিল অলিম্পিকে ভারত ৭ম হয়েছিল। বুয়েনস এয়ারসে চতুর্থ

খেলাধুলা

বিশ্বকাপেও ৭ম। ৭৮-এ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে ওই আশার আলো জাতীয় একটা কিছু দেখা গিয়েছিল ভারত ফাইন্যালে ওঠায়। কিন্তু ফাইন্যালে সেই পাকিস্তান নামক জুজুটির কাছে ভারত হারে ১-০ গোলে। পারথে এসেনজ হকিতে সেমিফাইনালেই উঠতে পারেনি ভারত। আর এই সেদিন দিল্লিতে হেরে গেল রাশিয়ার কাছে যে রাশিয়া হকিতে এখনও শিক্ষানবীশ।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন মসকোতে অলিমপিকের আসরে ভারত খেলতে পারবে কি না। এই অলিমপিকের [illegible] খেলবে ১০টি দেশ। ৬টি দেশ ঠিক হয়েই আছে। চ্যাম্পিয়ন কাপে ভাল খেলা করলে ভারত সরাসরি চলে যেতে পারত। এখন সব কিছু নির্ভর করছে ফেডারেশন অফ ইনটারন্যাশন্যাল হকির (এফ আই এইচ) ওপর। মসকোতে প্রি অলিমপিকের আসরে ভারত হেরে গিয়েছে আগেই। কুয়ালালামপুরে চতুর্দলীয় হকি প্রতিযোগিতায় ভারত আমন্ত্রিত হয়েছে। এশিয়ান কাপ হকিতেও ভারত আমন্ত্রিত। ইসটারের ছুটির জন্যে হল্যানড ও পশ্চিম জারমানি কুয়ালালামপুরে যেতে পারছে না। এই দুটি প্রতিযোগিতায় ভারত ভাল ফল দেখাতে পারলে মসকো যাবার একটা সুযোগ, ক্ষীণ হলেও [illegible] দিতে পারে। এশিয়া থেকে দুটি দেশ মসকোয় গেলে একটি যাবে পাকিস্তান। বাকি দেশের দাবিদার ভারত হতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

চ্যাম্পিয়নস কাপে এই দুর্দশার কারণ খুঁজতে যাওয়া অনর্থক সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়। তবে একদা ভারত ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় লতিফুর রহমান তিরিশ বছরের বেশি বয়সের খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গড়ার কড়া সমালোচনা করেছেন। ৫২ থেকে ৬০— তিনটি অলিমপিকে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছেন লতিফুর রহমান। তিনি বলেছেন, দল গঠনের সময় নির্বাচকরা আসল ব্যাপারটিকেই উপেক্ষা করে গেছেন। নির্বাচকদের এটা জানা উচিত ছিল যে খেলা হবে অ্যাসট্রো টারফের ওপর। কৃত্রিম মাঠে খেলার জন্য যে প্রচণ্ড শারীরিক ক্ষমতা দরকার এই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের তা নেই। এরা সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফিটনেস ও স্পিড না থাকলে অ্যাসট্রো টারফে খেলা মানে নিজের কবর নিজের হাতে খোঁড়া। নির্বাচকদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

রহমান সাহেবের সমালোচনায় ভারতীয়দের টনক কিছুটা নড়েছে বলে মনে হচ্ছে। মসকো যাওয়ার আগে অ্যাসট্রো টারফে অনুশীলনের জন্যে পাকিস্তানের সাহায্য চেয়েছে ভারত। ভারতীয় হকি ফেডারেশন ইসলামাবাদে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে এস বাজপেয়ী মারফৎ পাক হকি ফেডারেশনকে অনুরোধ করেছে, অ্যাসট্রো টারফে অনুশীলনের সুযোগটুকু যেন ভারতীয়দের দেওয়া হয়। পাকিস্তান হকি ফেডারেশন সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পাকিস্তান ছটি খেলায় ১২টি পয়েনট পেয়ে। অর্থাৎ সবকটিতেই জিতেছে পাকিস্তান। দ্বিতীয় পশ্চিম জারমানির পয়েনট ৯। তৃতীয় হয়েছে অসট্রেলিয়া ৭ পয়েনট পেয়ে। হল্যানডও পেয়েছে ৭ পয়েনট কিন্তু গোলের গড়ে তারা চতুর্থ। পঞ্চম ভারত। গোলের গড়ে ষষ্ঠ স্পেন। ভারতের মত তাদেরও পয়েনট ৪। সপ্তম বা শেষ স্থানে আছে ইংল্যানড। তাদের ঝুলিতে একটি পয়েনটও জমা পড়েনি। এবার এই প্রতিযোগিতায় গোলের ফুলঝুরি ফুটেছে। ২১টি খেলায় মোট গোল হয়েছে ১২৬টি। সর্বোচ্চ গোলদাতা হল্যানডের লিটজেনস (১৩)। দ্বিতীয় পশ্চিম জারমানির উলরিখ স্ট্রোজর (১২)। তৃতীয় ইংল্যানডের কাট্রারাল। ইংল্যানড প্রতিযোগিতায় [illegible]টি ৮টি গোল করেছে। সবকটি গোলই করেছেন কাট্রারাল। চতুর্থ স্থানে আছেন ভারতের দাবিন্দর সিং। দাবিন্দর করেছেন সাতটি গোল। এটাই ভারতের একমাত্র সান্ত্বনা।

মড়া নিয়ে যারা ঘর করে

স্বপনকুমার গোস্বামী



সেই গল্পটি মনে আছে ? রাস্তার ধারে এক মৃতদেহের কপালে লেখা ছিল, 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'। কৌতূহলী এক ব্রাহ্মণ মৃত ব্যক্তির মাথাটি নিজের বাড়িতে এনে রেখে দিলেন ললাটলিখনের পরিণতি জানবার জন্য। তার স্ত্রী মৃত মুখটি স্বামীর প্রেয়সীর মনে করে, তা ছিন্নভিন্ন করে বিষ্ঠাপাত্রে ফেলে গায়ের জ্বালা মেটালেন। ব্রাহ্মণ ললাটলিপির এ ভয়াবহ পরিণতি দেখে শিউরে উঠেছিলেন কিনা জানা নেই।

এ যুগে নিহত নায়ক কিংবা অপঘাতে মৃত ব্যক্তির দেহ ব্রাহ্মণের হেপাজতে না গিয়ে চলে যায় কোন না কোন মর্গের ডোমনিয়নে। ডোমেরা হতভাগ্যের দেহটি কেটে-কুটে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ খুঁজে বেড়ায়। এভাবে হত্যার কারণ নির্ধারিত হয়। ডোমের বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষগুলি এই ঘৃণিত নোংরা কাজ করে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করে। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, হত্যা কোনদিন বন্ধ হবে কিনা কে জানে। যতদিন এগুলি চলবে ততদিন পোসটমর্টেমও অব্যাহত থাকবে।

জ্যোতিষ মতে 'লগ্ন থেকে বা আত্মকারক গ্রহস্থিত রাশি থেকে তৃতীয়ে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকলে সেই গ্রহনির্দিষ্ট কারণে অগ্নিদাহ, গলায় দড়ি, জলে ডোবা বা পতন-জনিত ঘটনায় অপমৃত্যু হয়। দুর্বল লগ্নপতি ও মৃত্যুপতি মঙ্গল বা ষষ্ঠপতির সঙ্গে যুক্ত হলে জাতক ছুরিকাঘাতে খুন হতে পারে, চতুর্থপতিযুক্ত লগ্ন অষ্টমপতিযুক্ত বা ষষ্ঠস্থ চতুর্থপতি শনিযুক্ত বা দৃষ্ট হলে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। লগ্ন ও দ্বিতীয়পতি শনিযুক্ত হয়ে দুঃস্থানস্থ হলে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার কারক হয়।'

কারণ যাই হোক, মৃত দেহ মর্গে এলে সবাই সমান। কোটিপতি কিংবা ভিখিরি—ডোমেদের কাছে পরিপূর্ণ সাম্যবাদ।

সাধারণের কাছে যেটা ভীতিপ্রদ মর্গ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের তা হল ফরেনসিক ও স্টেট মেডিসিনের ক্লাসরুম। আবার মতি, লালা বা জগগুডোমের কাছে তাই হল জীবিকার সংস্থান ও বাসস্থান। মরচুয়ারি বা মর্গের আশেপাশেই ডোমদের নোংরা আস্তানা। এমনই এক মর্গে বসে সর্দার লালা ডোম ওরফে কাটুরিয়া মল্লিক শোনাচ্ছিল তার গল্প। পোসটমর্টেম রুমের নিশ্ছিদ্র তারের জানালা দিয়ে রোদ প্রায় ঢোকেই না, চারদিকে উৎকট পচা মড়ার দুর্গন্ধ, পাশের কোলড স্টোরের মধ্যে জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে কিছু হতভাগ্য প্রতীক্ষা করছে লাশকাটা টেবিলে ওঠার অপেক্ষায়। সারা ঘরে আগের পোসটমর্টেম করা বডিগুলির ভিসেরা পাকস্থলীর ভুক্তাবশেষ, জরায়ুর অংশ ইত্যাদি ফর্মালিন জারের মধ্যে রাখা আছে রিপোর্টের অপেক্ষায়। র‍্যাকের ওপর মৃতের পরিধেয় রক্তমাখা নোংরা পোশাক পরিচ্ছদ পুঁটলি করে বেঁধে গাদা করা। এই এসব—মূল্যবান 'সাক্ষ্যপ্রমাণ' থেকেও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘরের মধ্যে শ্বেতপাথরের বা মোজেয়িক লাশকাটা টেবিল। পাখার তলায় টেবিলটি এনে তার ওপর কোন ডোম হয়তো আরামে ঘুমোচ্ছে। আর এক পাখার তলায় একটি খাটিয়ায় একটি ছেঁড়া মাদুর। ডোমেদের ছেলেমেয়েরা মুড়ির বাটি হাতে কিংবা রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইতস্তত ঘরে বাইরে মর্গে বাবার খাটিয়ায় বসছে। কোন বিকার নেই। বাইরে একপাল শুয়োর ঝগড়া মারামারি চিৎকার করছে। সব মিলিয়ে এক বীভৎস নারকীয় পরিবেশ।

এখন সকাল। তাই তাড়াহুড়ো নেই। বেলা দশটা নাগাদ অফিস খুললে থানার লোকজন, অপঘাতে মৃত শোকার্ত আত্মীয় পরিজন একে একে এসে ভিড় করবে। ফরেনসিক অ্যানড স্টেট মেডিসিনের অধ্যাপক এলে পোসটমর্টেম শুরু হবে। একজন 'মানুষ' ডাক্তারের কাছে গেলে হয় 'পেসেনট' বা রোগী, হাসপাতালের ওয়ার্ডে ভর্তি হলে পরিচিতি হয় 'নম্বর' দিয়ে মারা যাবার পর ডোমের কাছে সে হয়ে যায় 'বডি'। 'বডি' পাঁচদিন ডোমের হেফাজতে বাকসবন্দী হয়ে পড়ে থাকলে এবং স্বজনেরা খোঁজ-খবর না করলে তা 'অ্যানক্লেমে বডি' হয়ে যায়। মরণের পরের এই 'আনক্লেমে বডি' দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের দেহতত্ত্বের অ-আ-ক-খ শেখান হয়, ডিসেকশন ও পোসটমর্টেমের মাধ্যমে।

'একদিনেই ২৫০/৩০০ বডি পোসটমর্টেম করেছি এমন দিনও গেছে 'রতের' সময়।' লালার কথা শুনে চোখ ছানাবড়া হবার জোগাড়। তবে 'রত' যে 'রায়ট'—অর্থাৎ সেই ভয়াবহ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার দিনগুলির কথা বলছে তা বুঝতে সময় লাগে। রবিবার বা ছুটির দিনগুলি বাদ দিয়ে এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত গড়পড়তা দশ-বারোটা থেকে উনিশ-বিশটা বডি পোসটমর্টেম করতে হয়। পোসটমর্টেম করতে হয়নি এমন দিন বিরল। তবে 'আমাদের কাজ এমারজেনসির ডাক্তারবাবুদের মত। স্পেশাল কেস মানে কোন নেতা, এসটাফ (স্টাফ), স্টুডেনটবাবু, ডাক্তার, বা খুব বড় আদমী খুন-টুন হলে বা অ্যাকসিডেন হলে ছুটির দিনেও স্পেশাল পোসটমর্টেম করতে হয়। হ্যাঁ, নিজের জানাশোনা আত্মীয় পরিজনেরও পোসটমর্টেম করেছি। আমার নিজের বোনেরই বডি নিজে কেটেছি। কি করব বড়বাবু, এই তো আমার নোকরি ! সেই আঠারো বছর বয়সে এই কাম শুরু করে একটানা চালিয়ে যাচ্ছি।'

অনেক ডাক্তার স্টুডেনটবাবুকে লালা পোসটমর্টেমে হাতে খড়ি দিয়েছে। তার পোসটমর্টেমের আওতায় অতি বিকৃত পচাগলা বডি থেকে দুর্ঘটনায় হাড় মাংস কুচি কুচি হয়ে দোকানে কেনা মাংসের মত একরাশ মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কবর থেকে খুঁড়ে তোলা হাড্ডিসার বডি থেকে শুরু করে একদা যার ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি-অবনি বহিয়া যেত এমন বডিও এসেছে। বেওয়ারিশ বা তথাকথিত 'আনক্লেমে বডি' থেকে নামী জননায়ক বা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় খবর হওয়া নিহত নায়ক সকলকেই সে তার ছুরির ডগার তীক্ষ্ণ টানে ফালা ফালা করেছে। পেটের দায় বড় দায় !

স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণপোষণ চালাতে একশ সত্তর-আশি টাকা হাতে পাওয়া বেতনের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী লালা, পোসটমর্টেমের প্রথম পাঠ নেয় বহু বছর আগে। মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে। পশ্চিমবাংলায় এসেছে মুঙ্গেরের বেগুসরাই থেকে। বাবা ছিল মর্গের সর্দার। ভবতী মল্লিক। বাবার পর মর্গের রাজা হয় ওর

চাচা চৌধুরী মল্লিক। তারপরে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গের সর্দার লালা। পশ্চিমবঙ্গের নামকরা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের কাছে কাজ করেছে। যে কোন জাতের খুন, যে কোন ভাবেই, যে যন্ত্রের সাহায্যেই হোক, তার চরিত্র নির্ণয়ে দক্ষ।

বডিটাকে দড়াম করে টেবিলে ফেলে বডির পায়ে লাগানো 'নেকলেবেল' (?) থেকে নাম নম্বর মিলিয়ে হেঁকে বলে যায়। পোস্ট-মর্টেম করণিক মিলিয়ে নেয় কাগজপত্র। খাতায় নোট নেয়। লালা হেঁকে বলে যায় মৃতদেহের বর্ণনা, পরনে কি রঙের পরিধেয় বস্ত্রাদি, শরীরে কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কিনা, ঘড়ি আঙটি, চুড়ি, উল্কি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ। তারপর ছুরি বা স্ক্যালপেল নিয়ে চুলের মুঠো ধরে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত চামড়াটা চিরে ছাগলের চামড়া ছাড়ানর মত ঝপাঝপ ছাড়িয়ে নেয়। করাত দিয়ে মাথার খুলিটা কেটে 'ব্রেনম্যাটার' বের করে তাতে কোন বিকৃতি আছে কি না দেখে নিয়ে ওজন করে পাশে ফেলে রেখে দেয়। নিপুণ হাতে ছুরির একটানে চিবুক থেকে তলপেট দুর্ফাঁক! না, হাত কাঁপা টাপা ওসব ফালতু সেনটিমেনটাল ব্যাপার তার নেই। এবার বাটালি হাতুড়ি দিয়ে বক্ষপঞ্জরের মাঝখানের উপাস্থি 'স্টারনাম' কচ করে কেটে দুপাশের হাড় মাংস চামড়া আলাদা করে হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, লিভার, পাকস্থলী, নাড়িভুঁড়ি থেকে জরায়ু সমস্ত কেটে ভাল করে পরীক্ষা করে ওজন করে নেয়। তার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস যথা ভিসেরা, খাদ্যাবশেষ ইত্যাদি সংরক্ষিত করে রেখে দেয়। বিশেষ প্রয়োজন মাফিক বিশেষ অঙ্গের কাটা ছেঁড়া চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণের হদিশ মেলে। শব ব্যবচ্ছেদ হয়ে গেলে বাইরে আনা ভিসেরা, ব্রেন, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস সব পেটে পুরে দিয়ে গুণছুঁচ দিয়ে কাঁথা সেলাইয়ের মত বডিটি সেলাই করে দেয়। তারপর এটিকে লাশকাটা টেবিল থেকে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্য বডি তোলে। হাতটা জলে ধুয়ে নিয়ে পার্টি'র কাছ থেকে বকশিস (?!) নিয়ে এককাপ চা খেয়ে নেয়, ঐ পরিবেশে ওখানে বসেই।

অনেকের মতে খৃস্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে 'জ' 'ড' হয়। যম আজ তাই ডম ডোম— যক্ষ, দক্ষ। যম থেকে ডোম শব্দের উৎপত্তি। ভাষাতাত্ত্বিকেরা যাই বলুন, মর্গ ঘুরে গেলে এ বিষয়ে দ্বিমত থাকবে না।

লালাকে প্রশ্ন করেছিলাম প্রথম যেদিন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা চালিয়েছিল সেদিন কোন দয়ামায়া, হাত কাঁপা, মাথা ঝিমঝিম করা, বা কোন বিশেষ অনুভূতি হয়েছিল কি না?—না। কোনও ভয়, ভূতপেত্নী, জিন পরী কোনও অনৈসর্গিক ঘটনা চোখে পড়েছে কি না? না। সত্যিই তো! মর্গের লাশকাটা টেবিলেই যারা তোফা ঘুম দিয়ে ক্লান্তি দূর করে তাদের ভূতপেত্নী করবে কি? তবে ওদের একজনের বক্তব্য হল--'না বড়বাবু, ভয় ঠিক নয়। তবে জীনকে (অপদেবতা!) তুষ্ট রাখার জন্য শয়তানের পুজো দিই ফি বছর নিয়ম করে।' যে দেবতার যেমন নৈবিদ্য। শয়তানের নামে শুয়োর বলি বা বধ করে মদ সহযোগে মহোৎসব। অনেকটা রক্ষেকালী পুজো করে বিপদ থেকে বাঁচার প্রচেস্টা।

লালাদের এই কাজ বংশানুক্রমিক। তার ছেলেও এই কাজ করবে। লেখাপড়া শেখাবার পয়সা কোথায়? গরীব লোক। অন্য পেশার চাকরি কে দেবে? একছেলে ইতিমধ্যেই মর্গে মুর্দা বইবার কাজ শুরু করে দিয়েছে। ডোমরা কেউ লেখাপড়া জানে না। যদিও এদের অ্যানাটমি জ্ঞান প্রখর। অসিপিট্যাল (occipotal), ম্যাসটয়েড (Mastoid), গ্লুটিয়াস ম্যাকসিমাস (Gluteus Maximus) ম্যানডিবল (Mandible) প্রভৃতি দুর্বোধ্য ল্যাটিন শব্দ উচ্চারণ এবং তার অর্থ বোঝা ওদের কাছে কিছুই নয়। আগে ওরা সর্বজনীন সরস্বতী পুজো করত। পর পর কজনের অপঘাতে মৃত্যু হয়। সেই থেকে সরস্বতী বরবাদ হয়ে কালী এসেছেন পুজো নিতে।

যারা 'কলেজবাড়ি'র ডোম, তারা ডোম-সমাজে কিঞ্চিৎ হরিজন। তাদের কাজকর্ম একটু অন্যরকম। তারা ডাক্তার ছাত্রদের জন্য 'বডি' তৈরি করে, 'হাড্ডি' বানায়। রোগীর স্বজনরা না নিয়ে গেলে এবং বডি আনক্লেমড হয়ে গেলে এদের হাতে পৌঁছয়। পুজোর ছুটির পর ডিসেকশন হলে ডিসেকশন ক্লাশের জন্য অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি বডি' সরবরাহ করতে হয়। এখন অবশ্য বডির অভাবে ডিসেকশন ব্যাহত হচ্ছে। এম বি বি এস 'ফার্স্ট' ও ফাইনাল পরীক্ষায় শব ব্যবচ্ছেদ উঠে গেছে, অপারেটিভ সারজারি পরীক্ষাতেও ডাক্তারী ছাত্রদের মড়ার ওপর অপারেশন করা বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক ছাত্রদের শেখার জন্য বডির শিরা ধমনীর স্বাভাবিক রং বজায় রাখা প্রয়োজন। তার জন্য মৃতদেহে এক অপরূপ মিশ্রণের ইনজেকশন দেওয়া হয়। এক পাউণ্ড আর্সেনিক ও এক পাউণ্ড সোডিবাইকার্ব জলে ভাল করে ফুটিয়ে তাতে চার আউন্স সিঁদুর এবং গ্লিসারিন বেশ করে বার্লি তৈরির মত নেড়ে চেড়ে মেশাতে হয়। এর পর ঐ মিশ্রণে ঢালা হয় ফর্মালিন। 'বেওয়ারিশ বডির' উরুদেশের মোটা ধমনী ফিমোরাল আর্টারি কেটে ঐ মিশ্রণটি সাইফন প্রক্রিয়ায় ইনজেকশন দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ইনজেকশন চলে। ঐ ফর্মালিন ইনজেকশনে মৃতদেহ কয়েকমাস পচে না, ধমনীর রং লাল বর্ণের থাকে। ইনজেকশনের পরের কাজ বডির সমস্ত চুল কেটে ফেলে চোখমুখ প্রভৃতি ছিদ্রপথ সেলাই করে বন্ধ করে তার গায়ে অলিভ অয়েল ও গ্লিসারিন ম্যাসাজ করা। এই ভাবে তৈরি বডি ডোমেরা টেবিলে পৌঁছে দেয় ডিসেকশন ক্লাসের ছাত্রদের জন্য।

কলেজ বাড়ির ডোমেদের আর একটি কাজ ও ব্যবসা 'হাড্ডি' তৈরি করে বিক্রি করা। যে সব বডির ডিসেকশনে যাবার মত যোগ্যতা নেই তাদের অত তোয়াজ বা ম্যাসাজ না করে অল্প জলে পচতে দেওয়া হয়। আধপচা হলে বডিটাকে কম্বল ছেঁড়া চট জড়িয়ে অল্প গরমে পচান হয়। বেশ ভালভাবে পচে মাংস হাড় থেকে খসে পড়তে থাকলে, একটা ছুরি দিয়ে হাড় থেকে মাংস চেঁচে তুলে ফেলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত মাংস (মাসল, টেনডন লিগামেনটসহ) হাড় থেকে উঠে না যাচ্ছে ততক্ষণ এভাবে পচান হয়। মানুষপচা এই মাংস দিয়ে দেওয়া হয় হিন্দু সৎকার সমিতি বা আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম-এর হাতে।

এবার হলদেটে রঙের হাড়গুলি জলে ভেজান হয়, হাড় থেকে মেরু মজ্জা ও রক্ত বের করার জন্য। দিন দুই পরে ঐ রক্তমাংসশূন্য হাড়গুলো সোডা দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। তারপর রোদে শুকনো করে নেওয়া। ব্যস, এক সেট 'বোন' তৈরি হয়ে গেল। যার বাজার দাম আজ ১৭৫ টাকা। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি ভবনের লম্বা সিঁড়ির ধাপে ও পাশে বিশ ত্রিশটা পর পর সাজিয়ে রাখা মাথার খুলি, পরপর এক আকারের হাতের কিংবা পায়ের লম্বা হাড় যখন সাজান থাকে তখন 'ভয়' 'বিপদ' বা 'বিষ' চিহ্নিত লেবেলের এক বীভৎস বাস্তব প্রদর্শনী বলে মনে হয়। ঐ ডোমিনিয়নে হাড্ডি 'ধূপে শুখতে' দিয়ে ডোমরা তাস পিটছে, পাশে বাজছে 'বিবিধ ভার্তি' এ দৃশ্য তো আকচার।

শোনা গেল আজকাল বডিই কমে গেছে। ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। এদের কাছে জানা গেল আরেক জীবিকার লোকের কথা—যারা ডোম নয় তবুও গঙ্গাতীরে খুঁজে বেড়ায় পচা বা ভেসে যাওয়া মড়া, যা থেকে ওরা হাড্ডি বানাবে এবং বাইরে রফতানি করবে। বিদেশে মানুষের আসল হাড়ের দাম অনেক।

মর্গ থেকে বেরিয়ে আসার সময় আবার সেই নারকীয় পচা দুর্গন্ধটা নাকে এসে ধাক্কা মারল। শব্দ করে একটা কালো ক্রসযুক্ত পুলিশ গাড়ি এসে থামল। শুয়োরগুলো দৌড়ে পালাল। লালার দলবল 'মাডার কেসের বডি' নামাতে এগিয়ে গেল!! ★

ছবি এঁকেছেন : নিতাই ঘোষ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অষ্ট আনাই রাজনীতি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর কয়েকটি দেশে মাঝে মাঝে বসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আসর। আলাদাভাবে হয় নতুন পরিচালকদের ছবির উৎসব। উৎসব হয় স্পোর্টস, শর্টস, অ্যানিমেশন, শিশু চলচ্চিত্র প্রভৃতিরও। জার্মানির মানহাইম শহরে অনুষ্ঠিত হয় পরিচালকদের প্রথম ছবির আন্তর্জাতিক উৎসব। মানমর্যাদা, গুরুত্ব ও ব্যাপকতার দিক থেকে কান, বার্লিন এবং মসকো চলচ্চিত্র উৎসবই প্রধান। প্রতিটি উৎসবই প্রতি-যোগিতামূলক। বিভিন্ন বিভাগে একাধিক পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাথমিকভাবে বহু ছবি আসে। সেগুলি বাছাই করে মূল প্রতিযোগিতায় দেখানো হয়। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সাংবাদিক ও সমালোচকরা এইসব উৎসবে যোগ দেন। এক একটি উৎসবের আয়োজন করতে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়। ফিলম ইনডাসট্রি ও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার সক্রিয়ভাবে ঢালাও অর্থ সাহায্য না করলে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা সম্ভব হয় না। মসকো চলচ্চিত্র উৎসবের পুরো দায়িত্ব সরকারের। স্পেন ও বার্লিনের মত চলচ্চিত্র উৎসব শুধু যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট তা-ই নয়, সরকার এইসব উৎসবে প্রচুর ভরতুকি দিয়ে থাকেন। কোন না কোনভাবে সরকারী অনুমোদন ছাড়া তাই এই ধরনের উৎসব করার কথা ভাবা যায় না। ফলে চলচ্চিত্র উৎসবগুলি হয় ফিলম ইনডাসট্রি,না হয় সরকারের কব্জায় গিয়ে পড়েছে। কিছু আদর্শবাদী লোক মহৎ কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব উৎসবের আয়োজন করেন না; তাই উৎসবে ফিলম ইনডাসট্রি ও সরকারের স্বার্থটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীতে কোন প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্রোৎসবেরই আয়োজন ফিলম ক্লাব বা চলচ্চিত্র সমালোচকরা করেন না। ফলে অবধারিতভাবে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। সরকারের সাহায্য ছাড়া চলচ্চিত্রোৎসব হয় না বলে সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন উৎসবের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলির ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। রাজনীতি আসে কোথাও সরাসরিভাবে, আবার কোথাও তা খুব সূক্ষ্ম। মসকোয় এই রাজনীতির ব্যাপারটি তুলনা-মূলকভাবে কিছুটা স্পষ্ট। রাজনীতি হয়ত স্থূলভাবে থাকে না, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যাবেই। তথাকথিত সামাজিক সচেতনতার কিছু না কিছু নজির ছবিতে থাকলেই হল। বার্লিন উৎসবে রাজনীতিটা আবার অনেক সূক্ষ্ম। এখানে চড়া দাগের বামপন্থী রাজনীতি কোন কাজ করে না। ছবিতে অর্ধোন্নত দেশগুলির শোষণ, নিপীড়ন তুলে ধরলে বা কোনভাবে মুক্তির বাণী শোনালেই যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তা নয়। ছবিতে স্টাইলের খেলা, তা যদি স্থূলভাবেও হয়, দেখাতে পারলেই ছবির ভাগ্য অনেকখানি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কারণ স্টাইলপ্রধান ছবিতে সাদামাটা রাজনৈতিক বিবৃতি থাকে না। বার্লিন উৎসবে পুরস্কার পাওয়ার এটা একটা বড় মানদণ্ড। ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবেও এই প্রবণতা দেখা যায়।

মসকোয় যে বছর সুচিত্রা সেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছিলেন সে বছর শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার অর্থাৎ গ্রাঁ প্রি পেয়েছিল ফেলিনির 'এইট অ্যানড হাফ' ছবিটি। 'এইট অ্যানড হাফ' ছবিতে একাধিক অভিনেত্রী অসাধারণ অভিনয় করেছেন। শোনা যায়, মসকো উৎসবের বিচারকমণ্ডলী একই ছবিকে গ্রাঁ প্রি এবং তার কোন একজন অভিনেত্রীকে বেসট অ্যাকট্রেসের পুরস্কার দিতে চাননি। অথচ ফেলিনির 'এইট অ্যানড হাফ'-এর মত ছবিকে গ্রাঁ প্রি না দিলেই নয়। সে বছর পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি থেকে বেশ কিছু যুদ্ধের ছবি প্রতিযোগিতায় গিয়েছিল। ছবিগুলি নায়িকা-প্রধান ছিল না। সে জন্যই নাকি বিচারকমণ্ডলী 'সাত পাকে বাঁধা' ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেনকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার দেন। সুচিত্রা সেনের অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার কথা স্বীকার করেও প্রশ্ন থেকে যায়, উন্নয়নশীল একটি দেশের অভিনেত্রীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়ার পিছনে সেবার মসকোর বিচারকমণ্ডলীর অন্য কোন কারণ ছিল কি?

রাজনীতি বলতে আমি বোঝাতে চাইছি বিশেষ এক ধরনের মতাদর্শের খেলা। বিভিন্ন বছর কান, বার্লিন ও মসকোয় কোন কোন ছবি, পরিচালক ও শিল্পীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তা যদি একটু খতিয়ে দেখা যায় তাহলে রাজনীতির ব্যাপারটা স্পষ্ট টের পাওয়া যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দিই। ১৯৬৯ সালে কানে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে পুরস্কৃত হন ব্রাজিলের গ্লবার রসা এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ভজটেক জাসনি। গ্লবার রসা ব্রাজিল ছেড়ে তখন আলজিরিয়া ও কিউবায় ছবি করছেন। এখন আবার তিনি ব্রাজিলে ফিরে গিয়েছেন। ১৯৬৯-এ কানে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হন ভানিসা রেডগ্রেভ। এমনিতেই ফ্রানস ও ইটালিতে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবপ্রতিপত্তি বেশি। তারপর আবার ১৯৬৮ সালে ফ্রানসে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের পর প্রগতিবাদের একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। ভানিসা রেডগ্রেভ ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বেশ একটা জঙ্গী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কানে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার কি পরোক্ষভাবে তার ওই ভূমিকারই স্বীকৃতি। ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও ভিয়েতনাম সম্পর্কিত ছবির পুরস্কার পাওয়ার কিন্তু ছেদ নেই। কান উৎসবে গ্যানটার গ্রাসের বিখ্যাত 'দি টিন ড্রাম' উপন্যাসের চলচ্চিত্র ভাষ্যের সঙ্গে একত্রে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছে মারকিন পরিচালক ফ্রানসিস ফোর্ড কোপ্পোলার ভিয়েতনাম এপিক 'এপোকালিপস নাউ'-এ ছবিটি। টেকসাসের পটভূমিকায় 'ডেজ অফ হেভেন' নামে নীতিকথা প্রবণ ছবির মারকিন পরিচালক টেরেনস মালিক পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার।

মসকো উৎসবে ১৯৬৯ সালে যে তিনটি ছবি গ্রাঁ প্রি পেয়েছিল তার মধ্যে দুটি ছবিই কিউবা (লুসিয়া) ও রাশিয়ার (আনটিল মনডে)। কানে যেমন উদ্ভট স্টাইলসর্বস্ব বইকে পুরস্কার দেওয়া হয়, ভেনিসেও ঠিক ওই একই প্রবণতা দেখা যেত। ভেনিসে ১৯৬৮-তে পুরস্কৃত হয়েছিল পশ্চিম জার্মানির পরিচালক আলেকজানডার ক্লুগের ছবি। ইংরেজিতে তার ওই ছবিটির নাম 'আরটিসটস আনডার দ্য বিগ পট ডিসওরিয়েনটেড'। কয়েক বছর আগে কলকাতার ম্যাকসমুলার ভবনে এই ছবিটি কিছু বিতর্কিত ছবির সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৭৮-এ ছবিটি কলকাতায় দেখানো হয়। স্টাইল এত জটিল যে দু-তিনবার দেখলেও ছবিটি বোঝা যায় না।

পশ্চিম জার্মানির পরিচালক ফাসবিনডার ১৯৭৪-এ বার্লিনে বিশেষ পুরস্কার পেয়ে-ছিলেন। ১৯৭৫-এ কানে পশ্চিম জার্মানির আরেক পরিচালক হারজগের ছবি 'দা এনিগমা অফ কাসপার হাউসার' বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছিল। তথাকথিত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার নানা সমস্যা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে যারা তাদের ছবিতে নিজস্ব নতুন স্টাইলে তুলে ধরেন তাদের ছবি পুরস্কৃত হওয়ার আদর্শ জায়গা হল বার্লিন বা কান।

এখন কান ও বার্লিনে প্রধান উৎসবের

পাশাপাশি একই সময়ে পালটা চলচ্চিত্র উৎসব করা হয়। কানে ক্রিটিকস উইক ও ডাইরেক্টরস ফোরটনাইট নামে এই উৎসবে বামপন্থী ছবিগুলি প্রাধান্য পায়। বার্লিনে ফোরাম ডেস ইয়ুঙ্গেন ফিলমস (Forum des jungen Films) বা তরুণ চিত্র পরিচালকদের ফোরামের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই উৎসবগুলি প্রধান উৎসবের পাশাপাশি একই সময়ে আলাদা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রীকে প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, 'আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কম। ১৯৭৪-এ তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছিলাম। ওখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে, বিশেষ করে মৃণাল সেনের সঙ্গে ছবি নির্বাচনের মানদণ্ড নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছিল। উৎসবে এমন কিছু ছবি দেখানো হয়েছিল যা সত্যিই প্রতিক্রিয়াশীল। যেমন ছিল পাকিস্তানের ছবি। আবার অন্যান্য দেশ থেকে যত ভালো ছবি আসার কথা, তত ভালো ছবি আসেনি। সোভিয়েট-জাপান যৌথ উদ্যোগে তৈরি যে ছবি দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন হয় সেটা অনেকটা বোমবাইয়ে তৈরি ফর্মুলা ফিলমের মত। পাকিস্তানের ছবি নিয়ে যে দিন প্রেস কনফারেনস বসে সেদিন মৃণালবাবু ছবিটি সম্বন্ধে তার প্রতিবাদ জানান। পরের দিন ফেসটিভ্যাল বুলেটিনের শিরোনাম হয়—ইনডিয়া অ্যাটাকস প্যাকিস্তান। এটা ভারতীয় প্রতিনিধিদলের খুব খারাপ লাগে। এ নিয়ে উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মৃণালবাবুর দীর্ঘ আলোচনা হয়। মৃণালবাবু তার দীর্ঘ বক্তব্য লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন।

'এছাড়া আমার নিজের যেটা দৃষ্টিকটু লেগেছিল সেটা হচ্ছে জাপানী প্রতিনিধিদলের প্রতি কর্তৃপক্ষের স্বতন্ত্র মনোযোগ। সারা বিশ্বের প্রতিনিধিদের জন্য যে হোটেল, জাপানী প্রতিনিধিদের সেখানে রাখা হত না। তাদের জন্য ছিল আলাদা ব্যবস্থা। যেদিন আমার ছবি 'স্ত্রীর পত্র' নিয়ে প্রেস কনফারেনস হয় সেদিনই তার আগে ছিল জাপানী ছবির প্রেস কনফারেনস। জাপানীদের বেলায় সে কী তোড়জোড়! একাধিক টি ভি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তৎপরতা। কিন্তু ভারতীয় ছবির বেলায় দায়সারা ভঙ্গি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, চলচ্চিত্র উৎসবের সবটাই চলচ্চিত্রকে কেন্দ্র করে নয়, আট আনা কিংবা ছ'আনা রাজনীতির জন্য বরাদ্দ থাকে।'

ভারত থেকে কিভাবে বিদেশের উৎসবে ছবি যায়? প্রখ্যাত সমালোচক ও থিয়েটার বিশেষজ্ঞ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় রিজিওনাল প্যানেল ফর সিলেকশন অফ ফিলমস ফর ইনটারন্যাশনাল ফেসটিভালস-এর সদস্য ছিলেন। তার কাছ থেকে জানা গেল—আঞ্চলিক কমিটিকে প্রথমে সারা বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের একটা তালিকা দেওয়া হয়। পরিচালক ও প্রযোজকরা লোকমুখে খবর পেয়ে আঞ্চলিক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে তাদের ছবি পুরস্কার পাবে এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা নিয়েই তারা আঞ্চলিক অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সচেষ্ট হন। উনি তারপর প্যানেলকে ছবিটি দেখার জন্য সুপারিশ করেন। প্যানেল কখন কী ছবি দেখবেন তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। সবটাই আগোছালো ব্যাপার। প্রতিটি চলচ্চিত্র উৎসবের একটা জাত বা চরিত্র থাকে। তার সঙ্গে যদি কোন একটা ছবিকে লাগিয়ে দেওয়া যায়-মনে মনে এর একটা হিসেবনিকেশ করে প্যানেল তাদের দেখা ছবিগুলিতে সেই অনুযায়ী এক একটা সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কোন একটি ছবি হয়ত প্যানেলের দু একজন সদস্যের ভালো লাগল না। কিন্তু তার মানেই যে ছবিটি বাতিল হয়ে গেল তা নয়। ছবিটা দেখার পর কেউ হয়ত বললেন, দিন না অমুক প্রতিযোগিতার জন্য সুপারিশ করে। ওখানে এ ধরনের ছবি চলে। গত চার-পাঁচ বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কী ধরনের ছবি পুরস্কার পাচ্ছে তা খতিয়ে দেখলেই এটা বোঝা যায়। প্যানেলের কাছে গোটা ব্যাপারটাই একটা জুয়ার মত। কোন ছবি কোথায় পুরস্কার পাচ্ছে এটা তারা বড় করে দেখেন না। ভারতীয় ছবির কোথাও কোন একটা পুরস্কার পাওয়াটাই তাদের কাছে বড়। মানহাইমে



পরিচালকদের প্রথম ছবির যে উৎসব ও প্রতিযোগিতা হয় আঞ্চলিক প্যানেল সেখানে অঞ্জন দাসের 'সৈনিক' ছবিটি পাঠানোর সুপারিশ করেন। ছবিটি তাদের যে ভালো-লেগেছিল তা নয়। তবে তারা ভেবেছিলেন মানহাইমে প্রতিযোগিতা সীমিত। সুতরাং ওখানে ছবিটি পুরস্কার পেলেও পেতে পারে। শেষ পর্যন্ত ছবিটি অবশ্য সেখানে পুরস্কার পায়নি।

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন প্রমুখের ছবি প্রতিযোগিতা থেকে সরাসরি আমন্ত্রণ পেয়ে থাকে। তাদের ছবি আঞ্চলিক প্যানেল দিয়ে যায় না। তবে আঞ্চলিক প্যানেল সুপারিশ করলেই যে ছবি বিদেশের প্রতিযোগিতায় যাবে এমন কোন কথা নেই। দিল্লির কেন্দ্রীয় প্যানেলই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। আঞ্চলিক প্যানেল কোন ছবিকে নাকচ করে দিলে ছবির প্রযোজক, পরিচালক সরাসরি তারপর দিল্লির কেন্দ্রীয় প্যানেলের কাছে ছবি পাঠাতে পারেন। তবে দিল্লির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'মুক্তি চাই' ছবিটি আঞ্চলিক প্যানেল নাকচ করে দিয়েছিলেন। তিনি পরে সরাসরি দিল্লির প্যানেলে ছবিটি পাঠান। সেখানেও ছবিটি নাকচ হয়ে যায়। কিন্তু দিল্লি কোন কোন ছবিকে বিদেশের প্রতিযোগিতায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তার তালিকা তারা আঞ্চলিক প্যানেলগুলিকে পাঠানোর প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেন না।

কোন কোন ছবির বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে ছবিটি অমুক উৎসবে আমন্ত্রিত। উৎসবে আমন্ত্রণের বিষয়েও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলাম। ওর বক্তব্য: এই আমন্ত্রণের ব্যাপারটা অনেক সময় একটা র‍্যাকেট। পৃথিবীতে ছোটখাটো বহু ফেসটিভাল আছে। এমনকি কোন কোন শহরের মিউনিসিপ্যালিটি বড় বড় ফেসটিভাল করে। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেন ডাইরেকটরেট অফ ফিলম ফেসটিভালস। সারা বিশ্বের চলচ্চিত্র উৎসবের তালিকা এই দফতরে পাওয়া যায়। ছবির প্রযোজক, পরিচালকরা এই দফতর থেকে তালিকা নিয়ে তাদের ছবির সারাংশ, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার প্রতিলিপি এবং সম্ভব হলে ছবি সম্পর্কে প্রখ্যাত কোন পরিচালকের প্রশংসাবাণী সমেত একটি আবেদনপত্র উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, ছবিটি তারা উৎসবে দেখাতে চান। কর্তৃপক্ষ আর কী করেন? চিঠির উত্তরে তারা ছবিটিকে পাঠাতে বলেন। ব্যাস, এটাকেই সংশ্লিষ্ট মহল 'অমুক উৎসবে আমন্ত্রিত' বলে জাহির করেন। বহু ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে দেখা যায়। তারা



দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে রাজকাপুর 'জুনুন'- এর শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন

কি বলেন অমুক উৎসবে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে? ঝাড়াই বাছাইয়ে ছবি বাদ গেল কিনা তারা কি কখনও সে কথা উল্লেখ করেন?

বার্লিনের ফোরাম অফ ইয়ং সিনেমার অধ্যক্ষ উলরিখ গ্রেগর মাঝেমধ্যেই দিল্লি ও কলকাতায় আসেন। স্থানীয় সিনেমা মহলের অনেকের সঙ্গেই তার অল্প পরিচয় আছে। কোন কোন পরিচালক পীড়াপীড়ি করে ওকে ছবি দেখান। উনি বলেন, আমাদের উৎসবে ছবিটা পাঠিয়ে দিন। প্রাথমিক এই নির্বাচন। এটাকে কিন্তু কোন ভাবেই আমন্ত্রণ বলা যাবে না। এতে কিছু প্রমাণিত হয় না। 'অমুক উৎসবে আমন্ত্রিত' একথা জাহির করার মধ্যে যে দেউলিয়াপনা থাকে তা কি অস্বীকার করা যায়?

মূল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া না পাওয়ার ওপর কোন ছবির গুণগত উৎকর্ষ নির্ভর করে না। চেতন আনন্দের 'নীচা নগর' কানে পুরস্কৃত প্রথম ভারতীয় ছবি। আবার কার্লোভি ভ্যারিতে গ্রাঁ পি পেয়েছিল রাজকাপুরের 'একদিন রাত্রে'। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই দুটি ছবির অবদান কী? বরং কোন কোন উৎসবে সমালোচকরা নিজেরা মিলেমিশে ছবি দেখে যে পুরস্কার দেন মূল প্রতিযোগিতার পুরস্কারের চেয়ে তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

ফেসটিভালের দিকে লক্ষ রেখে এখন এক জাতের ছবি তৈরির একটা ফরমুলা আছে। সাধারণ লোকে দেখবে বলে এই ধরনের ছবি তৈরি হয় না। পশ্চিম জারমানির ক্লুগে, ফাসবিন্দর ও হারজাগ ফেসটিভাল ফিলমই করেন। ওদিকে অভিজ্ঞ পরিচালকরা কিন্তু ফেসটিভাল সম্পর্কে ক্রমশ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছেন। ফেসটিভালে এমন সব রীতির ছবি পুরস্কার পায় যে, অনেক তাৎপর্যময় ছবি সেখানে আদৌ সুবিধা করতে পারে না। আবার আমাদের দেশে চলচিত্র উৎসবের টিকিট নিয়ে যে বাড়াবাড়ি হয় বিদেশে তা দেখা তো দূরের কথা, এমনকি ভাবাও যায় না। কারণ ছবিগুলো ব্যবসায়িকভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে ব্যবসায়িকভাবে মুক্তি পায়। চলচ্চিত্র উৎসবে নানা দেশের পরিচালক ও সমালোচকরাই ছবিগুলোর প্রধান দর্শক। বস্তুত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলো এক একটা সেমিনার ছাড়া কিছু নয়।

কান চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলে রাখা দরকার। কানের কাছেই সমুদ্র ও মনোরম সমুদ্রসৈকত। উৎসব উপলক্ষে সারা বিশ্বের সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, কলা-কুশলী, ফিলমস্টার ও নামকরা পরিচালকরা সেখানে যান। এটা মনে রেখেই অনেক উঠতি তারকাও সেখানে গিয়ে জড়ো হন। তারা সমুদ্রসৈকতে কেউ হয়ত নগ্ন বা অর্ধনগ্ন হয়ে শুয়ে থাকলেন, কিংবা হয়ত কারও সঙ্গে প্রেম করলেন। তৎক্ষণাৎ তারা খবরের হেডলাইন হয়ে গেলেন। বিশ্বের পত্রপত্রিকায় তাদের ছবি বেরিয়ে গেল। সারা পৃথিবীর ফিলম প্রেসকে কাছে পাওয়ার সুযোগটা তারা এভাবে কাজে লাগান। দর্শকরা তাদের দেখতেই বেশি উৎসাহবোধ করেন। ছবি দেখাটা মুখ্য নয়। এমনকি কান উৎসবে যোগদানকারী কোন কোন চিত্র প্রযোজক সমালোচক, দর্শক, ফটোগ্রাফার নির্বিশেষে অনেককেই সমুদ্রস্নান উপভোগ্য করে তোলার জন্য তোয়ালে, পোশাক আশাক ইত্যাদি উপহার দেন। ওইসব তোয়ালে বা উপহার দ্রব্যে তাদের ছবির নাম ইত্যাদি লেখা থাকে। সেটা প্রচারের কাজ করে। কান হচ্ছে বিগ শো-পিস। কানের জুরিতে নামকরা অভিনেত্রীদের প্রায়ই কাউকে না কাউকে দেখা যায়। বারলিনের ২৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জিনা লোলোব্রিজিদার আলোকচিত্র প্রদর্শনী নিয়ে বেশ হৈ চৈ হয়েছিল। উৎসবের সঙ্গে ওই প্রদর্শনীর সম্পর্ক যে কী বলা মুশকিল। জিনা তার ছবির পসরা নিয়ে দিল্লির ফিলম উৎসবেও এসেছিলেন। সুন্দরী অভিনেত্রীর চিত্র প্রদর্শনী যথারীতি একটা খবর হয়ে উঠেছিল।

চলচ্চিত্র উৎসব ও ছবির সমাদর প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও এখানে বলে রাখা দরকার। যে কোন ভাল ছবি তার নিজের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে। এটা আমার কাছে খারাপ লাগে যখন দেখি সত্যজিতের 'চারুলতার' চেয়ে 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' বিদেশী দর্শকদের কাছে বেশি সমাদর পাচ্ছে। 'চারুলতা' হয়ত ওদের কাছে বাস্তব নয়, অথচ ওই ছবি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে আসি আমাদের নিজেদের ফিলম উৎসবের কথায়। এখানের চলচ্চিত্র উৎসবে সচরাচর বড় পরিচালকরা ছবি পাঠান না। কারণ এখানে একটা অদ্ভুত নিয়ম আছে। এখানে ছবি দিলে সেই ছবি অন্য কোন প্রতিযোগিতা বা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো যাবে না। কান, বারলিন, মসকোর প্রতিযোগিতারও এই নিয়ম। বিদেশী প্রতিযোগিতায় পরিবেশকদের ছবি দেখিয়ে প্রিনট নিয়ে আর ঘরে ফিরে যেতে হয় না। উৎসব ও প্রতিযোগিতাগুলোকে ছবির বড় বাণিজ্যমেলাও বলা যায়। বড় বড় পরিবেশকরা আসেন। ছবি কেনাবেচার বাজার সেখানে ভাল জমে ওঠে। কিন্তু ভারতীয় উৎসবে যোগ দিলে ছবি বিক্রির সম্ভাবনা ততটা উজ্জ্বল নয়। ছবি পুরস্কার পাবে কিংবা তা বিক্রি হবে—এটা ধরে নিয়েই পরিবেশকরা উৎসবে ছবি পাঠান। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবের পুরস্কার কান, বারলিন বা মসকোর পুরস্কারের মতো অতটা সম্মানজনক বলে বিবেচিত হয় না। এডিনবরা, লনডন ও নিউ ইয়র্কের চলচ্চিত্রোৎসব হল 'উৎসবের উৎসব'। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে যে সব ছবি স্বীকৃতি পায় সেই ছবিগুলোই এইসব প্রতিযোগিতায় দেখানো হয়। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব কী পুরস্কার কী বিক্রিবাটা—কোন দিক থেকেই বিদেশের প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতাদের আকৃষ্ট করতে পারছে না।

তবে মাদ্রাজ ও দিল্লি ফিলমোৎসবে ফিলম ফাইনানস করপোরেশন ছিলেন উৎসবের যুগ্ম উদ্যোক্তা। করপোরেশন কিছু কিছু ছবি কিনছেন বলে বিদেশীরা ইদানীং এদেশের উৎসবের প্রতি কিছুটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ইনডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে আলাদা করে ভারতীয় ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হওয়ায় এক নাগাড়ে হাতের কাছে এ দেশের কিছু ভাল ছবি দেখার সুযোগও বিদেশীরা পাচ্ছেন। বিদেশে ভারতীয় ছবি বিক্রির সম্ভাবনাও তা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ★

কলকাতার অতিথি

জুত্তা ব্রুকনার

সন্ধানী



ছবির সঙ্গে চেহারার কোন মিলই নেই। প্রথমটায় মনে হয়েছিল 'ভুল করলাম নাতো!' ভুল ভাঙল মিঃ শাফনারের কথায়। পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—'হিয়ার ইজ মিসেস ব্রুকনার টু টক টু ইউ।'

একমাথা কালো চুল, চোখে গো-গো রঙিন চশমা, গলায় মোটা হাড়ের হার। পরনে ছাপা পানজাবি আর জিন, হাতে বালা। অনেকটা উদভ্রান্ত চেহারা যেন। হালকা রঙিন কাঁচ ভেদ করে চঞ্চল মণি দুটিকে ঘুরতে দেখা যায় অবিরত। চেহারায় মেদের আধিক্য সহজেই চোখকে টানে। আমেজ ধরায়।

এরই নাম জুত্তা ব্রুকনার। বয়স আটত্রিশ। সম্প্রতি কলকাতা ঘুরে গেলেন ম্যাকসমুলার ভবনের আমন্ত্রণে। ব্রুকনারের পেশা এবং নেশা হল ছবি তৈরি। ফিচার ফিলম। তিনি সঙ্গে এনেছিলেন নিজের দুটি ছবি ছাড়াও বান্ধবীদের তোলা আরও ছটি ছবি।

ওরা সবাই নিজেদের পরিচয় দেন ফেমিনিসট পরিচালক বলে। আলোচনার শুরুতেই তিনি বললেন জনসংখ্যায় আমরা মেজর হলেও ক্রিয়েটিভ কাজকর্মে আমরা সবাই পিছিয়ে, পুরুষরাই আমাদের এগিয়ে আসতে দেয়নি। রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরে আমাদের সীমাবদ্ধ রেখেছে।

অবাক হতে হল ব্রুকনারের মুখে এই অভিযোগ শুনে। বললাম 'জারমানির মত উন্নত দেশেও মহিলারা এতটা অবদমিত বিশ্বাস হতে চায়না।' ব্রুকনার বললেন—'আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, জারমানির অন্তত শতকরা সত্তরজন স্ত্রীকে স্বামীরা শারীরিক অত্যাচার করেন। অমানুষিক মারধোর খাওয়া এখন স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছে।'

—কোন প্রতিবাদ নেই?

—আছে, তবে খুবই কম।

—এই অত্যাচারের ঘটনাগুলো কি কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ? আমি অল্প আয়ের লোকের কথা বলছি। ব্রুকনার বিস্মিত করে দিয়ে বললেন—'না মোটেই তা নয়। উচ্চবিত্তদের মধ্যেই এই মারামারির ঘটনা বেশি। লোকলজ্জার ভয়ে কেউ কিছু বলেও না।'

অবশ্য শুধু এই অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যই ব্রুকনাররা কট্টর স্ত্রীবাদী হননি। তার মত হল—'পুরুষ শাসিত এই সামাজিক কাঠামোতে আমাদের সুযোগ কম। আমরা তাই স্ট্রাকচারটাকেই বদলে দিতে চাই। মহিলাশাসিত সমাজ হয়ত সেটা হবে না। /কিন্তু সেই নতুন কাঠামোতে আমরা আরও বেশি ভাল অবস্থায় ও অনুকূল পরিবেশে কাজ করতে পারব।

এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর ফিলমের ইতিহাসও পুরুষ কেন্দ্রিক। হলিউডের ছবি করিয়েরা মেয়েদের পণ্যদ্রব্য ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। ব্রুকনার বললেন—'আমরা চাই সেই ইমেজটা বদলে দিতে।'

জারমানির মাটিতে ব্রুকনার ও তার দলবল অবশ্য এমনতর 'মুক্ত' চিন্তা নিয়েও বেশিদূর এগোতে পারছেন না। ছবি তৈরিতে সরকারী সহযোগিতা তেমন মিলছে না। ব্যবসায়ী পরিবেশকদের কাছে এদের ছবি এখনও অস্পৃশ্য। টি-ভিতে যদিও বা দেখানো হয়, সময়টা বড় বেয়াড়া। সবাই যখন ঘুমের রাজ্যে অচেতন তখন টি-ভির পর্দায় ব্রুকনারদের স্ত্রীবাদী ছবিগুলো প্রতিবাদের চিৎকারে জেহাদ ঘোষণার ধারালো বাক্যবাণে তাদের ঘুম ভাঙাতেও বুঝি পারে না।

এই ব্যবস্থাটাকেই তিনি টি-ভি কর্তৃপক্ষের এক ধরনের 'বদমায়েসি' বলতে চান। পুরুষদের বিরুদ্ধে কিছু বলব, তা পুরুষরা সহ্যই করতে পারে না।

ছবি তৈরিতে অন্য কোন বাধা আছে কি? জানতে চাইলে তিনি বললেন—'আছে বৈকি! যেমন ধরুন আমার ছবির ক্যামেরাম্যানের কথাই বলি। তিনি পুরুষ মানুষ। নতুন ছবির জন্য যখন কয়েকটি শট আমি তাকে নিতে বললাম, তিনি অশ্লীলতার ধুয়ো তুলে অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। কাজ করতে চাইলেন না।'

—বিষয়টা কি ছিল?

'ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট। একটি কিশোরীর যৌবন আসার প্রথম মুহূর্তটিকে আমি ধরতে চেয়েছি ছবিটিতে। রজঃস্বলা হবার প্রথম দিন। সে আতঙ্কিত ভীত, লজ্জিত। তার এই মানসিক বিবর্তনটাকে মেয়েটির চোখ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি। ক্যামেরাম্যানকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম দৃশ্যগুলো অবশ্য প্রয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ। নিমরাজি হয়ে শেষ অবধি কাজ করলেন তিনি। কিন্তু অযথা বিতর্ক তো হল। মহিলা ক্যামেরাম্যান পেলে এই অসুবিধে হয়ত হত না।'

তিনি নিজে বহুদিন কাজ করেছেন জারমান পরিচালক স্লোলনডর্ফের সঙ্গে। হাতেখড়ি তার কাছেই। কিন্তু কোন পুরুষ পরিচালকের অধীনে থেকে স্ত্রীবাদী ছবি করা সম্ভব নয়। এমনকি ব্রুকনারের মতে 'ওয়্যান ক্যানট বি অ্যান আর্টিসট উইদাউট বিইং ফেমিনিসট।' সুতরাং তিনি আলাদা এখন।

অন্যান্য দেশের মহিলা পরিচালকদের সম্পর্কে তার মতামত হল মিশ্র। বেলজিয়ামের চানতাল আকারমান কিংবা হাঙ্গেরীর মের্তা মেসজারোস স্ত্রীবাদী, কিন্তু ফ্রানসের আগনেই ভার্দা কিংবা চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেরা চিটলোভা ব্রুকনারের কাছে একজন পুরুষ পরিচালকের সমান।

আর এই কলকাতার মহিলা পরিচালকরা?

ব্রুকনার কলকাতা থাকার কটা দিন তিন-চারটি মাত্র ছবি দেখেছেন। অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি' তার কাছে সেনটিমেনটাল ছাড়া কিছু নয়। সুহাসিনী মুলের ছোট ছবিটি একটু দীর্ঘ লেগেছে তার, কিঞ্চিত উদ্দেশ্যমূলকও বটে। অবাক হয়েছেন তিনি নীনা শিবদাসানির 'ছত্রভঙ্গ' দেখে। আগামী মারচ মাসে প্যারিসের এক উৎসবে হয়তবা ছবিটি দেখানোর বন্দোবস্ত করবেন তিনি।

কলকাতার মেয়েদের কেমন লাগলো? ব্রুকনারের জবাব: ভেরি গুড, ভেরি সেনসিটিভ। কিন্তু আমার এই আন্দোলন এবং মুভমেনট থেকে অনেক দূরে এরা। পরিচালক অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল তার। মিষ্টি ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের কথা তিনি স্ত্রীবাদী হবার নাকি একবারে অনুপযুক্ত। অন্তত ব্রুকনারের সংজ্ঞায়। ★

চিত্র-প্রদর্শনী

ক্যানভাস শিল্পী সংঘ

জলরঙে ছবি আঁকে এ্যামেচার, পেশাদার শিল্পী আঁকে তেলরঙে। প্রচলিত এই কথাটি যুক্তি হিসেবে সত্য বলে ধরে নিলে বিড়লা আকাডেমিতে ক্যানভাস আর্টিসট সার্কেল-এর চিত্র প্রদর্শনীর [২৭ নভেম্বর—৮ ডিসেম্বর '৭৯] প্রায় সব শিল্পীকেই পেশাদার আখ্যা দিতে হয়। কারণ অধিকাংশ কাজই তেলরঙের। কিন্তু শক্তিমান শিল্পী যশ-প্রার্থীর পক্ষেও ইজেলের সামনে ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে হোমটাস্ক না করলে প্রদর্শনীকক্ষে দর্শকের উদ্দীপনা 'জাগানোর মত ছবি আঁকা সম্ভব নয়।

বলাই কর্মকারের 'সিমবল অব লাইফ' [তেল রঙ] প্রসারিত হাতের ওপর একটি সবুজ চারাগাছ। পেছনে রক্তিম সূর্য। রঙ, বালি প্রভৃতির পুরু প্রলেপ দিয়ে ছবির সংস্থানিক তারতম্য সোচ্চার করা হয়েছে। দলীয় নির্বাচনী প্রতীকরূপে চিত্রটি ব্যবহৃত হতে পারে। স্বপ্নেশ চৌধুরী ও নীরেশ পোদ্দার আন্দামানে থাকেন। স্বপ্নেশ আন্দামানের সমুদ্রের রূপকে বিভিন্ন ছবিতে নীল, সবুজ ও কালো রঙে আঁকার চেষ্টা করেছেন। একটি চিত্রে বেলাতটে মানুষী আদলের পুরু ও মোটা কয়েকটি পাথরের চারদিকে পাখিরা আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। সমুদ্রের ঢেউ স্বপ্নেশ কি হোকুসাই-র বিখ্যাত চিত্রটির কথা স্মরণ করে এঁকেছেন ? 'গ্রেট ওয়েভ' বোধহয় অনুকরণ-সাধ্য চিত্র নয়।

নীরেশ পোদ্দারের 'স্মৃতির উদ্দেশ্যে' চিত্র দুটির নামকরণের তাৎপর্য বোঝা যায় না। উজ্জল আশমানী রঙের পশ্চাৎপট যেন সমুদ্রের ওপরের উদার নীল চাঁদোয়া। সামনে উৎকীর্ণ হয়েছে হলুদ রঙের সাংকেতিক চিহ্ন সম্ভবত উপজাতীয় ধর্মীয় প্রতীক। এই প্রাচীন প্রতীক চিহ্নকে নীরেশ খুব নিখুঁত ও মসৃণ করে এঁকেছেন। আদিম সংস্কারগত রূঢ় চিহ্নটি মনে হয় ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট অথবা টিক ভিনিয়ারের আসবাব।

একুয়ারেল-এ পরিমল দত্তরায়ের 'ইয়ার অব চাইলড' রঙিন তৈলাক্ত খাড়র কাজ বলে ভুল হতে পারে। বেলুনওয়ালা, পূজামণ্ডপ, ভিড়ভাট্টা ইত্যাদির একটি বর্ণাঢ্য চিত্র। বিভিন্ন বর্ণের আভিক্ষেপে ছবিটিতে সুন্দর সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। মানব বড়ুয়ার 'ড্রিম' [জল রঙ] —গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। শো সিরিজ [টেমপারা ও তেলরঙ] ক্লাউন জেব্রা ও টোপাজের খেলা বিবৃত এ অসমতল প্রাকৃতিক পটভূমিতে এঁকে জাগতিক ব্যাপারটাকেই বোধহয় সার্কাস এরিনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গাঢ় কালচে নীল রঙের আতিশয্য সহজেই চোখে পড়ে।

সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠী

বিড়লা আকাডেমিতে আয়োজিত সমকালীন শিল্পীগোষ্ঠীর চিত্র-প্রদর্শনী [১১-২৩ ডিসেম্বর '৭৯] নিঃসংশয়ে উচ্চ মানের।

তাসের রাজা রানী ছাড়া দুনিয়া থেকে রাজা ও রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে। মুখাবয়বহীন রাজা রানী ও কুমার তিনটি চিত্রে [জলরঙ] অনিলবরণ সাহা এই ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজকীয় ভাবমূর্তিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে কি এতটা অলঙ্করণ অপরিহার্য ছিল ? বিকাশ ভট্টাচার্যের 'ইন উইনটার' [তেলরঙ] পার্কের বেনচে বসা বৃদ্ধ দম্পতি, গায়ে জড়ানো মলিন শীতের চাদর। পেছনে জনজলে সবুজ গাছগাছালি। সবুজের দীপ্তি মাঝারি হলে ছবিটির বর্ণবৈষম্য এত প্রকট হতো না। গণেশ হালুই-র 'গ্রীন ফোলেইজ' স্লেট রঙের আকাশের নিচে ঘর, অস্বচ্ছ সবুজে সম্পৃক্ত পর্ণরাজি—একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র। মানু পারেখের পেইনটিং-২ [তেলরঙ] নীল বাদামী ও ফিকে সবুজ রঙে আঁকা অশ্ব বা অশ্বেতর কোন চতুষ্পদ জীব। রঙ-রেখার স্বল্পতা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে ছবিটি আকর্ষণীয় হয়েছে। কিমাশ্চর্যম ! প্রদর্শনী শেষ হবার আগেই দুর্বোধ্য কোন প্রয়োজনে চিত্রটি প্রদর্শনীকক্ষ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। শৈলেন মিত্রের 'কেইজ'-১/২ প্রধানত কালো এবং অল্প-স্বল্প নীল ও গোলাপী বিন্দুময় বর্গ ও সমায়ত ক্ষেত্রের বিন্যাস। রঙের হেরফের করে বেধ ও প্রস্থ আভাসিত হয়েছে। বস্তুত তলবণ্টনে মিনি স্কাইস্ক্র্যাপারের কৌণিক বিশেষত্ব ও খোপাকৃতিগুলি বজায় রাখার ফলে



'রানী'—অনিলবরণ সাহা

মনে হয় সমাজের খাঁচাটির সঙ্গে অত্যাধুনিক সৌধশ্রেণীর কিছু মিল আছে। সুনীল দাসের তেলরঙ 'জনৈক শিল্পীর মৃত্যু' চিত্রটি মনে করিয়ে দেয় টমাস মানের ডেথ ইন ভেনিসের গুস্তাভ ফন অ্যাকেনবাককে। যৌবনে তিনি সংবেদ ও সহজ প্রবৃত্তির মুখে লাগাম জুতে দিয়ে টেকনিকের ঘাটে শক্ত করে বেঁধেছিলেন শিল্পসিদ্ধির দুরাশাকে। মধ্যবয়সে অবদমিত সেই যৌবন ফিরে এসে মাশুল তুললো চড়া হারে। টেকনিক সর্বস্বতার বিপদের কথা সুনীল ভেবে দেখবেন। তার কাছে দর্শকের প্রত্যাশা এখনো শেষ হয়নি।

প্রণব নাগ

সংস্কৃতি-সংবাদ

কলকাতায় 'জ্ঞানপীঠ'

'আজকের দিনে প্রধান প্রয়োজন হল আত্মজ্ঞান অথবা আত্মবোধ। সমাজ সংস্কারের সমস্যা বিশ্বজনীন। তার জন্য রয়েছে নানান শ্লোগানও, কিন্তু সুস্পষ্ট সমাজ-রচনার নিখুঁত ছবি বিরল।'

—কবির কথা। কবি সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়'। সৃজনশীল সাহিত্যের জন্য যিনি ১৯৭৮ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। উপরের কথাগুলি বলে দেয় এ কবি দাঁড়িয়ে আছেন বাস্তবের মাটিতে, মানুষের পাশাপাশি।

'কিত্তনি নাওমে কিত্তনি বার (কতো নৌকায় কতোবার) কবি 'অজ্ঞেয়'র সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ কমিটির বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থটি ভারতীয় ভাষায় ১৯৭৮-এর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, কবি পেয়েছেন জ্ঞানপীঠের যশো মুকুট। পুরস্কার মূল্য এক লাখ টাকা।



কবি সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' কিন্তু এ মণিহার শুধু তার একার বলে মনে করেন না ; পুরস্কার লাভের পর তিনি বলেছেন : এ সম্মান তার একার নয়, সমস্ত সাহিত্যসেবীদের পক্ষে তিনি এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন।

অন্যান্যবারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দানের সঙ্গে এবারের পার্থক্য—পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতায়। কলকাতাতেই ১৯৬১ সালের ২২ মে স্বর্গীয়া রমা জৈন ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের পরিকল্পনা করেছিলেন।

শীর্ষস্থানীয় হিন্দি ভাষার কবি বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' অনেক বাঙালী পাঠকের কাছেই অপরিচিত। এর একটাই কারণ, হিন্দিই শুধু নয়, প্রতিবেশী ভারতীয় ভাষার সাহিত্য, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাহিত্য বাংলায় তেমন অনূদিত হয়নি। কবি 'অজ্ঞেয়' কিন্তু কলকাতার আপনজন। তিনি কলকাতায় প্রায়ই আসেন, কলকাতায় আছেন তার বহু বন্ধু বান্ধব, নিকটজন। এখানকার শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকদের অনেকেই তার প্রিয় বন্ধু।

'অজ্ঞেয়' মূলত কবি। কবিতার পাশা-পাশি গল্প উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরুষ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' হিন্দি কবিতায় নতুন হাওয়া এনেছিলেন ১৯৩৩ সালে। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় তার প্রথম কবিতাগ্রন্থ : ভগ্নদূত।

শুধু হিন্দি কবিতায় 'নঈ ধারার' জন্মই দেননি 'অজ্ঞেয়', তার 'সপ্তক' সম্পাদনার মাধ্যমে নবীন কবিদের নেতৃত্বও দিয়েছেন।

'অজ্ঞেয়'র মতে, কৃষক যে ভাবে ভূমি ভরিয়ে দেয়, একজন শিল্পীও ঠিক তেমনি তার নিজের জমিকে প্রথমে প্রস্তুত করে নেন—তারপর শিল্প-কৃতির সোনালী ফসলে ভরিয়ে তোলেন তার 'খেত'। সে শাশ্বত শস্য ভাণ্ডারে সবারই সমান অধিকার। কবির ক্ষেত্রে কবিতাই তার সোনালী শস্য—জনগণের সঙ্গে পরিচয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম : 'সর্বত্র খেতে পড়ে আছে পদচিহ্ন / (ছেড়ে গেছে সবাই) । / যাদের গড়ে সমাজ : / ওই পদচিহ্ন-গুলির পুজো হয়। / আমি অদৃশ্য সহজ / অপূজিত পতিত জায়গা ভাঙছি / এই ধরনের কাজে রয়েছে নিজস্ব সুখ / সেই সুখ নিজস্ব রচনা / তার সেই তার পুরস্কার।'

এই 'পতিত জায়গা ভাঙার' কাজই করে যাবেন 'অজ্ঞেয়', আমৃত্যু।

সন্তন কুমার পানড়ে

নাট্য-সমীক্ষা

আবার হব রাজা

প্রযোজনা : প্রত্যয়। **নাটক-নির্দেশনা :** জয় সেনগুপ্ত। **মঞ্চ :** নিতাই ঘোষ। **সঙ্গীত :** রবীন হালদার। **আলো :** চিন্ময় দাস। **পোশাক :** দর্পণ সাহা। **রূপসজ্জা :** শ্যামল দত্ত ও পৃথ্বীশ রায়। **অভিনয় :** ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৯, শিশির মঞ্চ।

এক যে আছে দেশ, সেখানে হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী। রাজা ঘুম থেকে উঠে তাঞ্জামে চড়ে 'ইয়ে' করতে যান, মাঝে মাঝে সুতোয় ঝোলান ললিপপ পেড়ে খান, সভাসদদেরও দেন। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি—সবাই ললিপপ চুষতে চুষতে যে যার কাজ গুছোবার চেষ্টা করেন। চুরি করা এ রাজ্যে আইনসঙ্গত, তবে ধরা পড়া চলবেনা। ধরা পড়লেই কঠিন শাস্তি। তাই এক বেচারা চোর যখন চুরি করতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙে ধরা পড়ে, তখন নাটক জমে ওঠে। সুরু হয় ন্যায়বিচার। রাজা তার সভাসদ—সবাই খুব চিন্তিত। প্রথম চিন্তা—কি শাস্তি দেওয়া হবে ! দ্বিতীয় চিন্তা—কাকে শাস্তি দেওয়া হবে ! ন্যায়বিচার লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে থাকে। তারপর কি হল ? নাঃ, অনেকখানি বলে ফেলেছি, আর বলা উচিত নয়।

প্রচলিত এই গল্পটিকে নাচে গানে ভরিয়ে, সমাজ রঙে রাঙিয়ে হাজির করেছেন প্রত্যয়ের শিল্পীরা। নাট্যকার, নির্দেশক জয় সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সকলের নিষ্ঠা আর যত্নের ছাপ এর সর্বাঙ্গে। তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে নিতাই ঘোষের অনাড়ম্বর অথচ ব্যঞ্জনাময় মঞ্চসজ্জা এবং চিন্ময় দাসের নাটকের চরিত্রানুযায়ী আলোক সম্পাত। নাচ আর গান দিয়ে নাট্যমালার মূল সূত্রটি সক্ষমভাবে ধরে রেখেছেন তাপস সিংহ। অনেকগুলি গান, তাই গানের সুরে আরেকটু বৈচিত্র্য প্রত্যাশিত ছিল। শুধুমাত্র দাদরা এবং কাহারবা তাল নাটকের মেজাজকে ক্লান্ত করেছে। সীমিত বৃত্তের মধ্যে থেকেও কৃষ্ণেন্দু মুখারজি, বিশ্বরূপ দাস রায়, শোভন দত্ত ও টুটুল মুখারজির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। গানে শ্রীকুমার ব্যানারজি কণ্ঠ উঁচু পর্দায় উঠতে বা খাদে নামতে সাবলীল নয়, তবে অভিনয়ে সপ্রাণ। পরিচালক প্রায় সবাইকে দিয়ে আয়াসসাধ্য নাচের মুদ্রা ব্যবহার করিয়েছেন, এ প্রয়াস কিন্তু সর্বত্র সফল হয়নি। তাপস সিংহ ছাড়া আর কেউই নৃত্যে দক্ষতা দেখাতে পারেননি এবং সেই জন্যেই নাটকের ঘটনাপর্ব শেষ হবার পরেও অতখানি সময় ধরে সম্মিলিত গান এবং নাচ প্রত্যাশিত ফল লাভের বিপরীত হয়ে ওঠে।

বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীঅরুণ কুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), হইতে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, (ফোন ২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯) হইতে প্রকাশিত।


এক-চক্ষু জলদস্যু
মূল কাহিনী ঃ রবিদাস সাহারায়
চিত্র কাহিনী ঃ অলোক দত্ত
শিল্পী ঃ পোলারিস
১
একটা ষণ্ডামার্কা লোককে সউপ বললো ।
নেডকে একটু মাথার ওপরে ঘোরাও ত' । ওর একটু হাওয়ার দরকার ।
ষণ্ডাটা নেডকে ঘোরাতে লাগল পা দুটি ধরে ।
ওকে ছেড়ে দাও ।
তা কি হয় সুন্দরী ? তোমাদের দুজনকেই যে আমার চাই ।
ওকেও একজন একটু ঘোরাও ত । মন্দাটা হাওয়া খাচ্ছে । ওর ত' খারাপ লাগবেই ।
নেড এবং রোজ দুজনকেই ঘোরাতে লাগল ।

ARIBARTAN 1 February 1980. Registration No 32815 78, Postal Registration No WB CC–380. Rs 1·50



আলোকচিত্র ঃ সোমনাথ চক্রবর্তী